দেশ কাল মানুষের আজ কাল পরশু

নাগরিক

দ্বিতীয় বর্ষ ❖১৫ সংখ্যা ❖১৭ ডিসেম্বর ২০২৫

➲ এই সংখ্যায় থাকছে

প্রবন্ধ

- লালন ফকির — তানভীর মোকাম্মেল — ৩
- সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ও বেগম রোকেয়া — শুভ বসু — ৭

শতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলী

- কিংবদন্তীর কমিউনিস্ট নেত্রী ইলা মিত্র — ৮
- ইলা মিত্রের পৈত্রিক ভিটে ইতিহাস, সংগ্রাম বিস্মৃত এক ঐতিহ্যের ঠিকানা — সাজেদ রহমান — ৯

আন্তর্জাতিক

- পশ্চিম এশিয়ায় ডোনাল্ড ট্রাম্পের শান্তি প্রস্তাব — সৌর বসু — ১০

বাংলাদেশ

- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও বুদ্ধিজীবী হত্যা — ১২
- ১৯৭১ দুটি অবিস্মরণীয় উপন্যাসের কথা — ফরিদ আহমেদ — ১৫

অর্থনীতি

- দ্রুততম বৃদ্ধির অর্থনীতিতে চাকুরি ছাঁটাই — অমিত দাশগুপ্ত — ১৭
- পশ্চিমবঙ্গে চাকরি ও কর্মসংস্থানের হাল — শুভ্রাংশু কুমার রায় — ১৮

দেশের খবর

- রোহিঙ্গা অন্তর্ধান– সুপ্রীম কোর্টের অমানবিক অবস্থান — মনিরুল হক — ২২
- সোনালি বিবি, সুইটি বিবিদের সঙ্গে চূড়ান্ত অমানবিক ব্যবহার — সুকুমার মিত্র — ২৪
- স্কুলে নিয়োগ: কমিশন ও কোর্টের পাকানো জট — মজিবুর রহমান — ২৬
- সঞ্চারসাথী অ্যাপ : সরকারের ইউ টার্ন — শুভাশিস মজুমদার — ২৮
- রাজ্যে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ — শুভ মিত্র — ৩০
- রাহুল গান্ধির বক্তব্যে বারংবার বাধাদান — অমিতাভ সিং — ৩০
- সত্যের জয় হয়েছে — শুভ মিত্র — ৩২

ধারাবাহিক

- জরুরি অবস্থার প্রেক্ষাপট ও দক্ষিণপন্থী শক্তি — সুশান্ত দাসগুপ্ত — ৩২

বিশেষ নিবন্ধ

- ‘বন্দেমাতরম ‘ দেশপ্রেমের অনুপ্রেরণা — শান্তনু দত্ত চৌধুরী — ৩৪

সম্পাদক

শান্তনু দত্ত চৌধুরী

সম্পাদকমণ্ডলী - সৌর বসু, মিলন দত্ত, ড. সিদ্ধার্থ সেন, অমিতাভ সিনহা, মনিরুল হক, শুভাশিস মজুমদার।

সৌর বসু কর্তৃক সীমান্ত পল্লী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম, পিন-৭৩১২৩৫ থেকে প্রকাশিত।

ই-মেল- nagorik0240@gmail.com ♦ ফোন- 80178 04019 / 94340 22512 ♦ ওয়েবসাইট- nagorik.co.in

➲ সম্পাদকীয়

মহাত্মা গান্ধির নাম মুছে ফেলার চেষ্টা

১৯২৫ সালে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ডা. কেশব বলিরাম হেডগেওয়াড় । ডা. সাহেব মনে করতেন হিন্দুদের প্রধান দ্বন্দ্ব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে নয় ।হিন্দুদের প্রধান দ্বন্দ্ব মুসলমানদের সঙ্গে। তাদের সঙ্গে সংঘর্ষ হলে আর.এস.এস উপযুক্ত ভূমিকা গ্রহণ করবে। সংঘর্ষে বর্ণ হিন্দু যুবকদের উপযুক্ত ভূমিকা পালনের জন্য তিনি শারীরিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন।

ডা . হেডগেওয়াড় - এর তাত্বিক অনুপ্রেরণা বিনায়ক দামোদর সাভারকর একাধিকবার মুচলেকা দিয়ে ব্রিটিশদের প্রতিশ্রুতি দেন যে তিনি আর কোনও দিন স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেবেন না ।১৯২১ সালে সেলুলার জেল থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি কথা রেখেছিলেন। পরবর্তী ২৬ বছর আর কোনও ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে তিনি যোগ দেন নি। ডা.হেডগেওয়াড়ও সচেতন ভাবে আর.এস.এস কে ব্রিটিশ বিরোধী সমস্ত সংগ্রাম থেকে দূরে সরিয়ে রাখেন। ‘১৯২৩ সালে ‘ হিন্দুত্ব ‘ নামে পুস্তক লিখে সাভারকর বলেন হিন্দু ও মুসলমান দুটি পরস্পর বিরোধী আলাদা জাতি। তারা কখনও একসঙ্গে বাস করতে পারেনা।’ প্রকৃতপক্ষে মহম্মদ আলি জিন্না ১৯৪০ সালে লাহোরে মুসলিম লীগের অধিবেশনে দ্বিজাতিতত্ব’র ভিত্তিতে পাকিস্তান দাবি প্রচার করার ১৭ বছর আগে সাভারকর ভারতীয় সমাজে বিভাজনের জন্য দ্বিজাতিতত্ত্ব প্রচার করেন। সাম্রাজ্যবাদ এইটাই চেয়েছিল।

এই সাম্প্রদায়িক শক্তির মূল শত্রু ছিল সাধারণ ভাবে কংগ্রেস ও সুনির্দিষ্ট ভাবে মহাত্মা গান্ধি , পন্ডিত নেহরু ও নেতাজি সুভাষ চন্দ্র। তার কারণ তাঁরা ছিলেন গভীর ভাবে ধর্মনিরপেক্ষ, স্বাধীনতার যোদ্ধা ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী। জন্মের পর এই হিন্দু মহাসভা ও আর.এস.এস ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে কখনও যোগ দেয়নি। তারা ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে সহযোগিতা করেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাদের কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে ।একই সঙ্গে সমাজে হিন্দু - মুসলিম সংঘাত বাধানোর জন্য তাদের ও মুসলিম লীগকে ব্যবহার করেছে। কি আশ্চর্য এই দুই দল আবার সিন্ধু ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে একসঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গঠন করেছে। বাংলায় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন হিন্দু মহাসভার নেতা। তিনি পাকিস্তান প্রস্তাবের সমর্থক এ.কে. ফজলুল হকের সঙ্গে একত্রে মন্ত্রিসভা গঠন করেন।

আগস্ট আন্দোলনের সময় মহাত্মা গান্ধি সহ সারা দেশের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ কারারুদ্ধ হন। মুসলিম লীগ , হিন্দু মহাসভা ও আর.এস.এস ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করে। সরকার সারা দেশে চণ্ড দমন নীতি চালায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ তিন বছর পর মুক্তি পান। এর পরই উইনস্টন চার্চিল কে পরাস্ত করে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হন লেবার পার্টির ক্লেমেন্ট এটলী। তিনি ঘোষণা করেন ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে। কিন্তু মুসলিম লীগ সারা দেশ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু করে ।মহাত্মা গান্ধি বৃদ্ধ বয়সে নোয়াখালি , কলকাতা , বিহার , পাঞ্জাব সর্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পদযাত্রা করেন । তিনি যেখানে যান সেখানে শান্তি ফিরে আসে। কিন্তু আবারও পাঞ্জাব ও দিল্লিতে দিল্লিতে দাঙ্গা শুরু হয়। অনন্তকাল রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধ এড়ানোর জন্য কংগ্রেস দেশ ভাগের ভিত্তিতে স্বাধীনতা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। ১৯৪৭ এর ১৫ আগষ্ট যখন দেশ স্বাধীন হয় তখন ভগ্ন হৃদয় নিয়ে মহাত্মা গান্ধি কলকাতায় শান্তি রক্ষার জন্য অবস্থান করছিলেন। মহাত্মা গান্ধি সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা ও ধর্মীয় বিদ্বেষের বিরুদ্ধে আবারও ১৯৪৮ সালের ১৩ জানুয়ারি থেকে দিল্লিতে অনশন শুরু করেন। তাঁর অনশনের ফলে কী আশ্চর্য , দিল্লিতে শান্তি ফিরে আসে। হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক শক্তি ওই সময় তীব্র মহাত্মা গান্ধি বিরোধী অপপ্রচার চালাচ্ছিল। দিল্লিতে শান্তি ফিরে আসায় ক্ষিপ্ত হয়ে তারা ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি বিকেলে মহাত্মা যখন প্রার্থনা সভায় যাচ্ছিলেন তখন তাঁকে হত্যা করে। তিনি নিরাপত্তা রক্ষী নিতেন না। বহুবার বলেও তাঁকে রক্ষী দেওয়া যায়নি। সেই সুযোগে নিরস্ত্র এই শান্তির দূতকে বিনা বাধায় এক উন্মত্ত ও ধর্মান্ধ খুনি গুলি করে হত্যা করে। এই খুনি নাথুরাম গডসে ছিল সাভারকরের শিষ্য। গান্ধিজিকে হত্যার অভিযোগে নাথুরাম ও অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে সাভারকরকেও গ্রেপ্তার করা হয় ।তিনি বেনিফিট অফ ডাউট এর সুযোগে মুক্তি পেলেও পরবর্তী সময়ে জাস্টিস জে.এল.কাপুর কমিশন বলে সাভারকর এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে অবশ্যই জড়িত ছিলেন। এখন এই লোকটির মূর্তি আন্দামান সেলুলার জেলের সামনে। Air Port তাঁর নামে। সম্প্রতি তাঁর নামে ওখানে একটি পার্ক উদ্বোধন করা হয়েছে। বাংলার কোনও বিপ্লবীর নাম এদের মনে পরে না।

মহাত্মা গান্ধি কে হত্যা করেও তাঁর প্রভাব মুছে ফেলা যায়নি ।কবিগুরু তাঁকে ‘ মহাত্মা ‘ বলে সম্বোধন করেছিলেন ।সারা পৃথিবীর মনীষীরা যথা আইনস্টাইন, বার্নার্ড শ , বার্ট্রান্ড রাসেল , নেলসন ম্যান্ডেলা, মার্টিন লুথার কিং (জুনিয়র) প্রমুখ মহাত্মা গান্ধিকে শান্তির দূত বলে মনে করেছেন।

কিন্তু এই দেশে যারা মহাত্মা গান্ধিকে হত্যা করেছিল তাদের অনুগামীরা এখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন। তারা ভাবছে জনমানস থেকে মহাত্মা গান্ধির নাম মুছে ফেলবে। তারা ২০০৬ সালে কংগ্রেস পরিচালিত ইউপিএ সরকার ১০০ দিনের কাজের গ্যারান্টির জন্য আইন প্রবর্তন করে। ওই আইনের নাম দেওয়া হয় ‘ মহাত্মা গান্ধি গ্রামীণ রোজগার গ্যারান্টি এক্ট। গত সপ্তাহে এই আইনের নাম পাল্টে ‘ পূজ্য বাপু গ্রামীণ রোজগার গ্যারান্টি এক্ট ‘ করার জন্য গ্রামোন্নয়ন বিভাগ মন্ত্রী সভার কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছিল। সপ্তাহ ঘুরতেই গত সোমবার মোদি মন্ত্রীসভা এই আইনের নাম সম্পূর্ণ পাল্টে করেছে ‘ বিকশিত ভারত গ্রামীণ রোজগার ও অজীবিকা মিশন গ্যারান্টি ‘ বা সংক্ষেপে ‘ বিভি জি রাম জি ‘ বিল। অর্থাৎ মহাত্মা গান্ধির নাম মুছে বিলে ‘ রাম ‘ এর নাম। এ কোন রাম ? মনে পড়ে যায় আনন্দ পট বর্ধনের বিখ্যাত ছবি ‘ রাম কে নাম পর ‘ এর কথা। গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের জন্য প্রণীত আইনটি সাধারণ মানুষের জীবনে যে পরিবর্তন আনছিল, মোদি সরকারের এই খাতে প্রতি বছর বরাদ্দ কমানো ও টাকা আটকে রাখার ফলে ইতিমধ্যেই এই পরিকল্পনা পর্যুদস্ত। নতুন এক্ট সেই উদ্দেশ্যই চরিতার্থ করবে।

এরা অনেক কিছুই পাল্টাবে । আসল লক্ষ্য এই ধর্ম নিরপেক্ষ , বিজ্ঞানমনস্ক , সব ধর্মের নাগরিকদের ধর্মীয় স্বাধীনতার গ্যারান্টি এই সংবিধানটি পালটে ফেলা। সেজন্যই প্রয়োজন জনমানস থেকে মহাত্মা গান্ধির নাম মুছে ফেলা।

সেই দিকেই তারা এগোচ্ছে।

প্রবন্ধ

লালন ফকিরের উপর সুফিবাদের প্রভাব

তানভীর মোকাম্মেল

[লেখক বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক ও সাহিত্যিক তিনি একই সঙ্গে সাহিত্য . সমাজ, সঙ্গীত, লোক -- সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধকার। লেখক এই বিষয়ের ওপর তাঁর এই বক্তৃতাটি ইংরেজি ভাষায় প্রদান করেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। অনুবাদ লেখকের নিজস্ব। অতীব মূল্যবান এই প্রবন্ধটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হবে। আজ প্রবন্ধটির দ্বিতীয় কিস্তি প্রকাশিত হল। — সম্পাদক, নাগরিক]

(২)

লালন ও বাউল-ফকিরেরা সাধারণভাবে ছিলেন মুক্তচিন্তার মানুষ। তাঁদের জন্যে দেহ ও আত্মার স্বাধীনতা ছিল সবচে গুরুত্বপূর্ণ। লালন বলছেন ;

ফকিরী করবি ক্ষ্যাপা কোন্ রাগে
আছে হিন্দু মুসলমান দুই ভাগে।।

ভেস্তের আশায় মমিনগণ
হিন্দুরা দেয় স্বর্গেতে মন
ভেস্ত-স্বর্গ ফাটক সমান
কার বা তাতে ভাল লাগে।।

তাঁদের সংবেদনশীল মন ও অশাস্ত্রীয় সাধনচর্চার কারণে সুফিদের প্রেমময় আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণার প্রতি বাউল-ফকিরেরা সহজেই আকর্ষিত হয়েছেন। সঙ্গীতের প্রতি তাঁদের তীব্র আকর্ষণ এবং অদেখা এক ঈশ্বর, লালনের ভাষায় যা অচিন মানুষ বা সহজ মানুষ , তাঁর সঙ্গে মিলনের আগ্রহটাকে সুফিবাদ অনেকটাই পূরণ করতে পেরেছিল। লালনের সৃষ্টিতত্ত্ব অনুযায়ী ঈশ্বরের নিজস্ব কোনো ঘর ছিল না। তাই তিনি ভালবেসে এই মানবদেহকে সৃষ্টি করেছেন। মানবদেহটাকেই তিনি তাঁর নিজের আবাস হিসেবে বেছে নিয়েছেন এবং এক অদৃশ্য অচিন মানুষ , মনের মানুষ বা সহজ মানুষ রূপে মানবদেহে বসত গেড়েছেন। তাই কেউ যদি মানুষকে পূজা করে তাহলে সে ঈশ্বরকেই পূজা করছে;

ভবে মানুষ-গুরু নিষ্ঠা যার
সর্বসাধন সিদ্ধ হয় তার।।

নদী কিম্বা বিল বাওড় খাল
সর্বস্থলে একই সে জল
একা মেরে সাঁই, ফেরে সর্ব ঠাঁই
মানুষ মিশে হয় বেদান্তর ।।

নিরাকারে জ্যোতির্ময় হয় যে
আকার সাকার হইল সে
যেজন দিব্যজ্ঞানী হয়, সেহি জানতে পায়
কলি যুগে হো'ল মানুষ অবতার।।

অদৃশ্য ও ছলনাময় সেই স্রষ্টাকে, সেই অচিন মানুষ যে মানবদেহের মাঝে লুকিয়ে রয়েছে, তাঁকে খুঁজে পাওয়াই লালনের সাধনা ;

কে কথা কয় রে দেখা দেয় না।
নড়ে চড়ে হাতের কাছে খুঁজলে জনমভর
মেলে না ।।

খুঁজি যারে আসমান জমি
আমারে চিনিনে আমি
এ বিষম ভোলে ভ্রমি
আমি কোনজন সে কোন জনা ।।

ক্রমশ লালন উপলব্ধি করেন ;

ক্ষ্যাপা না জেনে তোর আপন খবর যাবি কোথায়
আপন ঘরে না খুঁজিয়ে বাইরে খুঁজলে পড়বি ধোঁকায়।
আমি সত্য না হলে গুরু সত্য কোন্ কালে
আমি যেরূপ দেখ না সেরূপ
দীন দয়াময় দীন দয়াময় ।।

মানবদেহকে বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের ক্ষুদ্র রূপ হিসেবে দেখা, যা আছে বিশ্বব্রহ্মান্ডে/ তা আছে দেহভান্ডে -র এই অদ্বৈতবাদী দর্শন, বাংলার আধ্যাত্মিক সাধকদের মাঝে এদেশে সুফিবাদের আগমনের অনেক আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে এই বিশ্বাসটি বাংলার দেহকেন্দ্রিক সাধকদের মাঝে বহমান ছিল, যা ছিল বৌদ্ধ তান্ত্রিকতা এবং নাথ-যোগীদের নানা সাধনচর্চা ও চৈতন্য-পরবর্তী বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনার, এক দার্শনিক উত্তরাধিকার।

নিজেকে জানা, যা প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র অনুযায়ী সবচেয়ে সেরা জ্ঞান, এই আত্মজ্ঞান দেখছি লালনের কাছেও ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান ;

আপনার আপনি ফানা হলে সকল জানা যাবে।
কোন রূপে হলে ফানা সে ভেদ জানতে পাবে ।।

আরবিতে বলে আল্লা
পারসিতে বলে খোদাতালা
গড বলছে যিশুর চেলা
ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভাবে?
আপনার আপনি হলে ফানা
দেখা দেবেন সাঁই রব্বানা।

অদৃশ্য এই ঈশ্বরের নানা অবতার ও লীলার নানা রূপের মাঝে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে মানব-অবতার;

অধরচাঁদের যতই খেলা
সর্ব-উত্তম নরলীলা।

এই অধরা ও অদৃশ্য ঈশ্বর মানবদেহের মাঝে লুকিয়ে থাকেন। লালনের সাধনাটা হচ্ছে এই অদৃশ্য অচিন মানুষ-কে মানবদেহ থেকে ধরা ।এবং সে কাজে মানবদেহটা হচ্ছে এক ক্রীড়াক্ষেত্র ;

শুদ্ধ প্রেম রসিক বিনে কে তারে পায়।
যার নাম আলেক মানুষ আলেকে রয়।।

রসিক রস অনুসারে
নিগূঢ় ভেদ জানতে পারে
রতিতে মতি ঝরে
মূলখন্ড হয়।

মানবদেহ ও ঈশ্বরের এই অদ্বৈততার দর্শন লালনের গানে ছড়িয়ে রয়েছে প্রায় সর্বব্যাপী;

আল্লা কে বোঝে তোমার অপার লীলে
আপনি আল্লা ডাক আল্লা বলে ।।

তবে ঈশ্বরের আবাস এই মানবদেহ কেবল একটা ক্রীড়াক্ষেত্র নয়, এটা নিজেই পরিণত হয় চূড়ান্ত এক অন্বেষাতেও। লালনের কাছে তাই দেখি মানবদেহটাই হয়ে উঠছে-মূল মক্কা। এধরণের পরম অদ্বৈতবাদী দৃষ্টিভঙ্গী চৈতন্য-পরবর্তী বৈষ্ণবদের মাঝেও ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল- 'হরি কে দেখিয়া হরি হরিতে লুকায়।' তবে একত্ববাদের এই বিশ্বাসকে সুফিবাদের আশেক-মাসুকের বিশ্বাস হিসেবেও ব্যাখ্যা দেয়া যেতে পারে।

লালন ফকির বিশ্বাস করেন ;

বরাতে করিল সৃষ্টি
তাই নিয়ে লেখাজোখা
পাবে সামান্যে কী তার দেখা
নিরাকার ব্রহ্মা হয় সে
সদাই ফেরে অচিন দেশে
দোসর নেই সে একা একা।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও গোটা সৃষ্টি রহস্যটাই বস্তু-ভিখারী লালনের কাছে এসে তাই দাঁড়াচ্ছে ;

ত্রিপিনের ত্রি-ধারে
মীনরূপে সাঁই বিরাজ করে।

এই যে স্রষ্টাকে মৎস্য প্রতীক হিসেবে দেখা, ভারতীয় যোগীদের মধ্যে এই বিশ্বাসটির প্রচলন অনেক পুরনো হলেও সুফিদের আনীত হযরত ইউনুসের কাহিনীর কথাও তা স্মরণ করায় যে হযরত ইউনুস মাছের পেটে ছিলেন। সঠিক সময়ে অধরা ওই মৎস্য- টিকে ধরতে প্রয়োজন বাঁধ নির্মাণ;

জগৎ জোড়া মীন অবতার
কারণ্য বারির মাঝার
বুঝে কালাকাল বাঁধিলে বান্ধাল
অনায়াসে সে মীন ধরতে পারে।

লালনের সাধনরীতি অনুসারে সাতটি তালা ভেঙ্গে ঈশ্বরের বারামখানা সেই বায়ুঘরে প্রবেশ করতে হবে। ওই অতি মহার্ঘ্য বায়ুঘরে অবশেষে সেই তঅধরা মানুষদ-কে পাওয়া ও ধরা যায়। ওই তঅচিন মানুষ দ মানুষের শরীরের দ্বি-দলে বসত করে। ইরা, পিঙ্গলা, সুষুম্না এসব শিরা তাঁকে ঘিরে রাখে। তাঁকে ধরার জন্যে সুপ্ত কুলকুন্ডুলিনী শক্তিকে জাগ্রত করতে হয়। এসবই দেহতান্ত্রিক যৌন সাধনক্রিয়ার অংশ।

কিন্তু কাজটা মোটেই সহজ নয়। তাই ওই লুক্কায়িত অদৃশ্য স্রষ্টাকে, অথবা 'অচিন পাখী'-টিকে, খুঁজতে লালনের পরামর্শ ;

চাতক যেমন মেঘের জল বিনে
দিবানিশি চেয়ে থাকে মেঘ ধিয়ানে।

প্রকৃত সাধকও তেমনি সেই বিশেষ মুহূর্ত, সেই মাহেন্দ্রক্ষণের, অপেক্ষায় থাকে।

আর সেই বিশেষ শুভক্ষণটি হচ্ছে বাউলের সাধনসঙ্গিনীর ঋতুচক্রের বিশেষ এক সময়কাল;

সে চাঁদ লক্ষ যোজন ফাঁকে রয়
হীরা-মোতি-জোহরা কোটিময়
উনকোটি দেবতা সঙ্গে আছে গাঁথা
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব-নারায়ণ জয় জয় জয়
সে চাঁদ পাতালে
উদয় ভূ-মন্ডলে
সে চাঁদ মাহেন্দ্র যোগে দেখা দেয়।

সেই দূর্লভ মাহেন্দ্রক্ষণটি না হারানোর জন্যে লালন তাঁর শিষ্যদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছেন। সময়কালটি তাই খুব গুরুত্বপূর্ণ ;

সময় গেলে সাধন হবে না।
দিন থাকতে দিনের সাধন কেন করলে না ।।

জান না মন খালে বিলে
মীন থাকে না জল শুকালে
কী হয় তার বাঁধাল দিলে
শুকনা মোহনায় ।।

অসময় কৃষি করে
মিছামিছি খেটে মরে
গাছ যদি হয় বীজের জোরে
ফল তো ধরে না।।

অমাবস্যায় পূর্ণিমা হয়
মহাযোগে সেদিন উদয়
লালন বলে তাহার সময়
দন্ডও রয় না।

নারী সাধনসঙ্গিনীর ঋতুকালীন সময়ের এক বিশেষ ক্ষণে পুরুষ সাধক তার লিঙ্গ দিয়ে সে বিন্দুকে শোষণ করে সোনার মানুষ - কে ধরার চেষ্টা করবে এবং তা হলেই সে পাবে তেজোদীপ্ত মানবদেহ, এমন কী-অমরত্বও। তাই যৌনমিলন শুধু দৈহিক কামনা মেটানোর জন্যে নয়। যৌন-সাধনার লক্ষ্য সোনার মানুষ বা অচিন মানুষ - কে ধরা। আর তা অর্জনে যৌনমিলনের সময় শরীরের উপর নিয়ন্ত্রণটা খুবই জরুরী। বিশেষ করে, বীর্য্যপাতকে নিয়ন্ত্রণ করা। সে কারণেই লালনপন্থী সাধক উর্ধ্বরতির চর্চা করে থাকে ;

শোসায় শোষে না ছাড়ে বাণ
ঘোর তুফানে বায় তরী উজান
ও তার কামনদীতে চর পড়েছে
প্রেমনদীতে জল পোরা।।

সুযোগ্য সাধক তাই বাণ ছাড়ে না। বীর্য্যকে যতটা সময় সম্ভব ধরে রাখতে চায়।

এই গূঢ় যৌনচর্চার সাধনায় পুরুষাঙ্গের উপর নিয়ন্ত্রণ অথবা বীর্য্যপাত না ঘটিয়ে রতিকে ধারণ করতে পারাটাই হচ্ছে সবচে বড় লক্ষ্য। যোনীর ত্রিবেণীসঙ্গমের পিছল ঘাট এড়ানো চাই। কেবলমাত্র একজন গুরু বা মুর্শিদই যে করণের আগম-নিগম বা রীতিনীতিটা জানেন এবং শিষ্যদের সেভাবেই উপদেশ দিতে পারেন। লালন তাই তাঁর শিষ্যদের অম্বুবাচীর রীতি মেনে যৌন সংসর্গ করার পরামর্শ দিয়েছেন। ফলে লালনের গানে যে সাধনচর্চা তার মূলে বায়বীয় কোনো বিষয় নেই, রয়েছে বীর্য্য, বাউল-ফকিরদের ভাষায় যা ' বস্তু', তা সংরক্ষণ করা। লালন ফকির ও তাঁর অনুসারী বাউল-ফকিরেরা তাই যথার্থ অর্থেই ছিলেন-' বস্তুবাদী '।

কেউ এই বিশ্বাস বা চর্চার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নিয়ে প্রশ্ন তুলতেই পারেন। তবে সৃষ্টিতত্ত্বের এই দেহকেন্দ্রিক সাধনা, এই চারি চন্দ্র বা পঞ্চম রস-য়ের ধারণাটি, তান্ত্রিক সাধনার সুপ্রাচীন এক ধারা হিসেবে সেই নাথ-তান্ত্রিকদের কাল থেকেই গ্রামবাংলার এক ধারার সাধকদের মধ্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে বয়ে চলে এসেছে।

সুফিবাদের একটা উপাদান হচ্ছে প্রেমে উন্মত্ত হওয়া, অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর স্রষ্টাদের মাঝে নিষ্কাম কিন্তু চরম ভাবাবেগপূর্ণ এক প্রেম। কিন্তু বাউলদের পুরুষ ও প্রকৃতি তথা নারীর যৌনসাধনা আদৌ নিষ্কাম কোনো বিষয় নয় বরং এক বিশেষ ধরণের যৌনতার চর্চা। বস্তু (বীর্য্য) ও ঋতুরক্তই লালনপন্থীদের কাছে প্রধান বিষয়। সাধকদের কাছে এসব বস্তুর সারকে বুঝতে পারাটা তাই খুবই জরুরী। সাধনার লক্ষ্য থাকে তাই উর্ধ্বরতি বা দমকে রক্ষা করা;

দমের সঙ্গে কর মিলন
আজব খবর জানবি রে মন।
লালনের মতে;
টলে জীব অটলে ঈশ্বর।

বীর্য্যরক্ষায় ঈশ্বরের মতো অটলতা অর্জনে দমের সাধনা তাই হয়ে পড়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়;

কামের ঘরে কপাট মেরে উজান মুখে চালাও রস
দমের ঘর বন্ধ রেখে যমরাজারে কর বশ ?

ফলে কাম মূল লক্ষ্য নয়। লালনের কাছে কামের প্রয়োজন কারণ তা হচ্ছে প্রেমের লতা;

বলবো কি সে প্রেমের কথা
কাম হয়েছে প্রেমের লতা
কামছাড়া প্রেম যথাতথা
নয় সে আগমন।।

সাধনার চরম লক্ষ্যটা তাই ঠিক দৈহিক কামজ লালসা নয়, অনুভূতির একটা উন্নততর স্তরে পৌঁছানো। কাম থেকে নিষ্কামী হওয়া। আর উন্নততর সে স্তরটা হচ্ছে-প্রেম। ভয়ঙ্কর ঝড়-তুফানের বিপক্ষে সাধক তার নৌকা বেয়ে যায়। তার কামনদী শুকিয়ে যায় কিন্তু প্রেম নদী রসে ভরে ওঠে। লালনের কাছে, কামজ থেকে কামহীন হওয়া, স্থূল যৌনকামনা থেকে আনন্দময় প্রেমের অনুভূতির স্তরে পৌঁছানোই হচ্ছে সাধনার চরম লক্ষ্য। অন্যথায় সারা জীবন মদনরাজার দাসত্ব করেই জীবন কেটে যাবে।

লালন বলছেন;

আগে কপাট মার কামের ঘরে
মানুষ ঝলক দেবে রূপ নিহারে।।

হাওয়া ধর অগ্নি স্থির কর
যাতে মরিয়ে বাঁচিতে পার
মরণের আগে মর
শমন যাক ফিরে ।।

বারে বারে করি মানা
লীলার দেশে বাস কোর না
রেখ তেজের তেজিয়ানা
উর্ধ্ব চাঁদ ধরে।।

এ এক নিগূঢ় আত্মসন্ধানী শিক্ষাপদ্ধতি। সাধনায় ব্রতী হয়ে ভেক-খিলাফত অর্জনের মাধ্যমেই কেবল একজন শিষ্য তার গুরু বা মুরশিদের কাছ থেকে সাধনচর্চার এই গোপন বিষয়গুলি পুরো শিখতে পারে।

পশ্চিম এশিয়ার সুফিবাদ ও লালন ফকিরের জীবনদর্শনের এক বড় পার্থক্য হচ্ছে সাধনার ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা। নারী বিষয়ে লালনের বিশ্বাস নারী হচ্ছে প্রকৃতির অংশবিশেষ এবং নারী পুরুষের চেয়ে বেশী সম্পূর্ণ। ফলে নারী পুরুষের চেয়ে উন্নত এবং নারীকে সম্মান করতে হবে কারণ নারী হচ্ছে 'চেতনগুরু'। নারী সাধনসঙ্গিনীকে ছাড়া 'সহজ মানুষ' ধরার পুরুষের সাধনা একেবারেই অসম্ভব। তাই প্রয়োজন যুগলসাধনা।

লালনের গানে তাই পাই ;

আছে আদি মক্কা এই মানবদেহে
দেখ না রে মন ভেয়ে ।।

করে অতি আজব ভাক্কা
গঠেছে সাঁই মানুষ-মক্কা
কুদরতি নূর দিয়ে
লালন বলে সেই গুপ্ত মক্কায়
আদি ইমাম মেয়ে

লালন আরো গাইছেন;

মায়েরে ভজিলে হয় সে বাপের ঠিকানা
নিগম বিচারে সত্য গেল তাই জানা ।।
ডিম্বু মধ্যে কেবা ছিল
বের হয়ে কারে দেখিল
লালন কয় সে ভেদ যে পেলো
ঘুচলো দিনকানা।।

একটা কৃষিভিত্তিক সমাজের উর্বরা-বন্দনার আদিম মাতৃমূর্তির চিত্রকল্পই যেন ফিরে আসছে এসব গানে যার সঙ্গে সুফিবাদ তথা আরবীয় ইসলাম ধর্মের তেমন কোনোই সম্পর্ক নেই।

তবে লালনের ধারণাগুলো আবার স্ববিরোধিতা মুক্ত নয়। এক দিকে তিনি বলছেন সন্তান জন্ম না দিতে কারণ তা আত্মাকে খন্ডিত করে, যে বিশ্বাসটি ফকিরী ঐতিহ্যের এক মূল বিশ্বাস। আবার মাতৃত্বকেও লালন এতটাই গৌরবান্বিত করেছেন যে মায়ের স্থান বলছেন খোদার পরেই, এমনকী নবীর উপরেও;

আছে দিন দুনিয়ায় অচিন মানুষ একজনা
কেউ তারে চিনেছে দড়
খোদার ছোট নবীর বড়
লালন বলে নড়চড়
সে নইলে কূল পাবা না।।

আর লালন-ঘরানার অন্যতম প্রধান ফকির, ফকির মহিন শাহ্ মতে সেই তঅচিন মানুষদ-টি হচ্ছে-মা। ৯৫ লালনপন্থী ফকিরদের কাছে মাতৃত্ব তাই সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, এমন কী, মহীয়ান কিছু।

লালন ফকিরের ধ্যান-ধারণার মূল যে বিষয়টি, নারী-পুরুষদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক বিশেষ ধরণের যৌন সাধনপ্রক্রিয়া, তাকে সুফিদের আশেক-মাসুকের স্বর্গীয় প্রেম অথবা বৈষ্ণবদের রাধা-কৃষ্ণের পুরাণের সঙ্গে মেলানো কঠিন। বাংলার এই ধরণের যৌন সাধনপ্রক্রিয়ার একটা শক্তিশালী লোকজ ভিত্তি রয়েছে এবং তা সুফিবাদ বা অন্য কিছুর চেয়ে বরং গ্রামবাংলার প্রাচীন নাথ-সহজিয়া-তান্ত্রিক সাধনারই এক ধারাবাহিকতা।

লালন বিশ্বাস করেছেন একজন মানুষ শুধু সাধারণ মানুষ নয়, প্রতিটি মানুষই ত মানুষরতন দ হওয়ার সম্ভাবনাময়-- এই মানুষে আছে রে মন/ যারে বলে মানুষরতন । সুফি মতবাদের এক ধরণের দ্বান্দ্বিকতা রয়েছে। তা হচ্ছে, স্রষ্টা ও সৃষ্টি এই দুই বিচ্ছিন্ন সত্ত্বা যখন মিলিত হয়, তখন ব্যক্তি যে কেবল পরিপূর্ণতা পায় তা নয়, সে মানুষের সাধারণ শারীরিক সীমাবদ্ধতাগুলিরও উর্ধ্বে উঠে যায়। একই ভাবে, লালনের বিশ্বাসের জগতেও দেখি সাধকের সঙ্গে যখন অচিন মানুষ- য়ের মিলন ঘটে, তখন সাধক মানুষটি পরিণত হয় মানুষরতন -য়ে। এক উন্নততর মানবসত্ত্বায়। বাউলের সাধনা এই মানুষরতন হয়ে ওঠার সাধনা।

সাধকের লক্ষ্য থাকে তাই কেবল ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানো নয়, নিজেই একজন মানুষরতন হয়ে ওঠার ;

মানুষ ভজলে সোনার মানুষ হবি
দ্বিদলের মৃণালে
সোনার মানুষ উজলে
মানুষ-গুরু নিষ্ঠা হলে
তবে জানতে পাবি।। (ক্রমশ)

এলোমেলো কথা

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ও বেগম রোকেয়া

শুভ বসু

বঙ্কিম চন্দ্র বড় লেখক। আমার তাঁর লেখা প্রিয় উপন্যাস কপাল কুন্ডলা। আর তাঁর প্রবন্ধাবলী যেমন কমলাকান্তের নেশা করে জীবন সম্পর্কে বক্তব্য প্রকাশ করা । কৃষ্ণকান্তের উইল আমার অন্য প্রিয় উপন্যাস। কিন্তু বঙ্কিম চন্দ্র জাতীয়তাবাদী হিসাবে বাংলার ক্ষতি করে গেছেন। তাঁর ইতিহাস চিন্তার দৈন্য সব থেকে গভীরে প্রতিফলিত হয় দুর্গেশ নন্দিনী, রাজসিংহ, আনন্দ মঠ, সীতারাম প্রভৃতি উপন্যাসে। তাঁর লেখার মাদকতা বাংলার জীবনে ' বন্দে মাতরম দুর্গাস্তবের ' সঙ্গে জাতীয়তাবাদের মিলন ঘটিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ যিনি ১৮৯৬ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে বন্দে মাতরম সংগীত পরিবেশন করেন তিনি ১৯৩৭ সালে সুভাষ চন্দ্র বসু কে একটি চিঠিতে লেখেন যাঁর ইংরেজি অনুবাদ আমি দিলাম "The core of Vande Mataram is a hymn to goddess Durga this is so plain that there can be no debate about it. Of course Bankim Chandra does show Durga to be inseparably united with Bengal in the end– but no Mussulman can be expected patriotically to worship the tenéôéhanded deity as Swades. "This year many of the "pecial [Durga] Puja numbers of our magazines have quoted verses from Vande Mataram—proof that the editors take the song to be a hymn to Durga. The novel Anandamath is a work of literature– and so the song is appropriate in it. But Parliament is a place of union for all religious groups– and there the song cannot be appropriate. When Bengali Mussulmans show signs of stubborn fanaticism– we regard these as intolerable. When we too copy them and make unreasonable demands– it will be self-defeating ." প্রসঙ্গত গান্ধিজি বন্দে-মাতরম শ্লোগান টিকে অপছন্দ করতেন এবং তিনি একে আল্লাহু আকবর এর সঙ্গে তুলনা করেন। ভারতের শহীদ এ আজম ভগৎ সিংহ ইনকিলাব জিন্দাবাদ স্লোগান টি দেন। এটি আমার প্রিয় শ্লোগান। মোদিজি পশ্চিমবঙ্গর নির্বাচন উপলক্ষে আবার বঙ্কিমচন্দ্রর কথা উল্লেখ করে বিভাজনের রাজনীতির আর একটি সূচনা করার প্রয়াস করছেন। আমার মাস্টার মশাই সব্যসাচী ভট্টাচার্য্য বন্দে মাতরম গানের একটি অসাধারণ ইতিহাস রচনা করেছেন । সেটি সকলে পড়ে দেখতে পারেন।

কিন্তু কদিন আগে বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান বেগম রোকেয়ার জন্মদিন চলে গেলো। তিনি পূর্ববঙ্গের রংপুরে জন্মগ্রহণ করলেও কলকাতা শহরে তাঁর জীবনের বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছেন। সে যুগের সম্ভ্রান্ত মুসলমান মহিলারা বাংলায় লিখতেন না। কলকাতা শহরে মুসলমান মহলে উর্দুর সমাদর ছিল বেশি দ্রত্ন -- তে শিবলী আজাদ একটি নিবন্ধে সে কথা উল্লেখ করেছেন। বিংশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলা ভাষাতে মুসলমান লেখকেরা লিখতে শুরু করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মীর মোশারেফ হোসেনের সূত্রে বাংলায় মুসলমান সাহিত্য প্রসিদ্ধি লাভ করে। তবে বিংশশতকের গোড়ায় কবি কায়কোবাদ বাংলা কবিতা রচনায় পারদর্শিতা দেখান। সেই সময় কলকাতায় এবং পূর্ব বাংলায় নানা বাঙালি মুসলমান সংবাদ পত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে মতিচূর প্রবন্ধসংগ্রহের প্রথম (১৯০৪) ও দ্বিতীয় খণ্ডে (১৯২২) বেগম রোকেয়া বাংলায় মুসলমান সমাজে বাংলা ভাষার সেবিকা হিসাবে উল্লেখ্য ভূমিকা পালন করেছেন। কিন্তু বেগম রোকেয়া হলেন আমাদের বাংলার প্রথম নারীবাদী লেখিকাদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর বৈশ্বিক পরিচিত রয়েছে নারীবাদী হিসাবে। তিনি বাংলায় প্রথম নারীবাদী কল্প বিজ্ঞানের লেখিকাও। তাঁর সাংগঠনিক কাজকর্ম বহু বিস্তৃত। আজকে বাংলাদেশে জামাতের উদয়ের মুহূর্তে এই নারীবাদী মহিলা কে স্মরণ করা অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করি। তবে আমাকে বিস্মিত করে পশ্চিমবংগধ্ব প্রগতিবাদীদের বেগম রোকেয়া সম্পর্কে নীরবতা নিয়ে। আমাদের বাংলায় এতো বড় নারীবাদী বুদ্ধিজীবী যাঁর মূল কর্মকান্ড কলকাতাকে কেন্দ্র করে তাঁকে নিয়ে অনেক বেশি প্রতিক্রিয়া আশা করেছিলাম। বিতর্ক আমার স্বভাব সিদ্ধ। কাজেই গালিগালাজের প্রত্যাশা করি।

(লেখক কানাডার ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক)

শতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি

কিংবদন্তীর কমিউনিস্ট নেত্রী ইলা মিত্র

ইলা মিত্র কিংবদন্তীর কমিউনিস্ট নেত্রী। তিনি ১৯২৫ সালের ১৮ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। বাবা নগেন্দ্রনাথ সেন ছিলেন বাংলা প্রদেশের ডেপুটি অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল। তাঁর দেশের বাড়ি ছিল অবিভক্ত যশোহর জেলার বর্তমান ঝিনাইদহ জেলার বাগুটিয়া গ্রামে। তিনি তাঁর গ্রামের সঙ্গে গভীর যোগাযোগ রাখতেন। ইলা মিত্র কলকাতার বেথুন স্কুল ও কলেজের ছাত্রী, তিনি বাংলায় ১৯৪৪ খ্রি. বি.এ. পাশ করেন। ১৯৩৬ থেকে ১৯৪২ খ্রি. পর্যন্ত খেলাধুলায় সারা বাংলায় তাঁর নাম ছিল প্রথম সারিতে। সাঁতারে পটু, অ্যাথলেটিক্স ছাড়াও বাস্কেটবল ও ব্যাডমিন্টন খেলাতেও তাঁর সুনাম ছিল। তিরিশের দশকে বাংলার ক্রীড়াজগতের তারকা ইলা সেন ১৯৪০ খ্রি. অলিম্পিকের জন্য ভারতীয় দলে নির্বাচিত হয়েছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে সেবার দ্বাদশ অলিম্পিক (১৯৪০) অনুষ্ঠিত হতে পারেনি।

ছাত্রাবস্থা থেকেই তাঁর রাজনৈতিক কর্মধারাও চলতে থাকে। কলেজে ছাত্রী সংগঠন গড়ে তোলেন। ১৯৪৩ খ্রি. নব প্রতিষ্ঠিত 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'র তিনি সদস্যা হন। নারী আন্দোলনের এই কাজের মধ্য দিয়েই ১৯৪৭ খ্রি. তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। তার আগে ১৯৪৫ খ্রি. রাজশাহী জেলার রামচন্দ্রপুরের তদানীন্তন জমিদার বংশের কমিউনিস্ট কর্মী রমেন্দ্রনাথ মিত্রের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। বিবাহের পর দু-বছর তিনি জমিদারবাড়ির গৃহবধূ হয়ে কাটিয়েছেন। পরে জমিদারবাড়ির প্রথা ভেঙে তিনি বাড়ির কাছেই তিনটি মেয়েকে নিয়ে এক স্কুল খোলেন। পাঁচ মিনিটের পথও তাঁকে গোরুর গাড়িতে যেতে হত। ক্রমে তিনি তাঁর স্বামীর মতো কৃষক আন্দোলনে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। পূর্ব পাকিস্তানের সরকার কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনি ঘোষণা করলে তাঁরা আত্মগোপন করে আন্দোলন চালিয়ে যান। এই অবস্থায় ১৯৪৮ খ্রি. তাঁর পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। ষোলো দিনের শিশুসন্তান মোহনকে রামচন্দ্রপুরে শাশুড়ির কাছে রেখে তিনি আবার তেভাগা আন্দোলনে গ্রামে গ্রামে ঘুরে কাজ করতে থাকেন। ১৯৪৭ খ্রি. থেকে পূর্ব পাকিস্তানের রাজশাহির নবাবগঞ্জে ও নাচোলে তেভাগার দাবিতে সাঁওতাল, হিন্দু ও মুসলমান ভাগচাষিদের আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠেছিল। এই আন্দোলনে আজহার হোসেন, অনিমেষ লাহিড়ী প্রমুখ অনেকের সঙ্গে মিত্রদম্পতিও ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন। নাচোলের তেভাগা আন্দোলনের কিংবদন্তি নেত্রী ছিলেন ইলা মিত্র। তাঁকে কৃষকরা 'নাচোলের রাণীমা' বলতো। ১৯৫০ খ্রি. জানুয়ারিতে নাচোল থানায় পুলিশি অত্যাচারে ক্ষিপ্ত উত্তেজিত কৃষকরা তিনজন পুলিশকে হত্যা করলে সেনাবাহিনীর হাতে গ্রাম পুড়ল, অসংখ্য মানুষ মরল। রহনপুর স্টেশনে সাঁওতাল রমণীর ছদ্মবেশে বসে থাকা ইলা মিত্র-সহ অনেককে নাচোল থানায় ধরে নিয়ে গিয়ে তাদের উপর বর্বরোচিত অত্যাচার চালানো হয়। চারদিন চাররাত তাঁর উপর পাশবিক অত্যাচার চলে। তাঁর শরীরের অবস্থা সংকটজনক হতে থাকলে তাঁকে রাজশাহির কারাগারের এক নির্জন সেলে এনে রাখা হয়। নভেম্বর ১৯৫০ খ্রি. নাচোলের পুলিশ হত্যার মামলায় একত্রিশজন-সহ তাঁকেও আসামি করা হয়। অত্যন্ত অসুস্থ শরীরেও তাঁকে স্ট্রেচারে করে কোর্টে নিয়ে যাওয়া হত। ১৯৫১ খ্রি.

অভিযুক্তদের যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়। পরে প্রমাণাভাবে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের হাই কোর্টের রায়ের পুনর্বিবেচনায় তাঁদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড কমিয়ে দশ বছরের সাজা দিতে সরকারপক্ষ বাধ্য হয়। তাঁর স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ঘটায় চিকিৎসার জন্য তাঁকে চলৎশক্তিহীন অবস্থায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯৫৪ খ্রি. ভারতে চিকিৎসার জন্য তিনি প্যারোলে মুক্তি পান। পরে অনেক চেষ্টায় ভারতীয় নাগরিকত্ব লাভ করে তিনি ভারতেই থেকে যান। পূর্ব পাকিস্তানে তাঁর সংগ্রামী কার্যকলাপ ও তাঁর উপর সরকারের নির্মম অত্যাচারের প্রতিবাদে অনেক কবি-সাহিত্যিক অনেক লেখা লিখেছেন। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য শহীদ সাবেবের 'শোকার্ত মায়ের প্রতি', সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'কেন বোন পারুল ডাকো রে', গোলাম কুদ্দুসের 'ইলা মিত্র', দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ফুল ফোটার গল্প'।
ওপারের চলচ্চিত্র পরিচালক ওহিদুজ্জমান ডায়মন্ড ' নাচোলের রাণী' শীর্ষক কাহিনীচিত্রটি নির্মাণ করেন।

ক্রমে তিনি সুস্থ হয়ে উঠে জীবিকার জন্য অনুবাদ করতে শুরু করেন। ১৯৫৭ খ্রি. বাংলায় এম.এ. পরীক্ষা পাশ করে ১৯৫৮ খ্রি. সিটি কলেজ (সাউথ)-এ অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন। কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী হিসেবে ১৯৬২ খ্রি. পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় নির্বাচিত হন। পরবর্তীকালে ১৯৬৭, ১৯৬৯ ও ১৯৭২ খ্রি. নির্বাচনেও তিনি জয়ী হয়ে বিধানসভায় শিক্ষা বিষয়ে, উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন, কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। ভারতেও মোট চার বার তিনি কারারুদ্ধ হয়েছেন।

১৯৯০ খ্রি. অধ্যাপনার জীবন থেকে অবসর নেন। ভারত সরকার প্রদত্ত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রাপ্য পেনশন তিনি পান ক্রিড়াক্ষেত্রে তাঁর অবদানের জন্য। রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে তাঁকে সম্মানিত করা হয়।

কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য পরিষদের সদস্যা ছিলেন দীর্ঘদিন। তাঁর অনূদিত গ্রন্থগুলি 'জেলখানার চিঠি', 'হিরোশিমার মেয়ে' (সোভিয়েট ল্যান্ড নেহরু পুরস্কারপ্রাপ্ত) , ' মনে প্রাণে '(২খণ্ড) ' লেনিনের জীবনী ', ' রাশিয়ার ছোট গল্প ' প্রভৃতি। তিনি ২০০২ সালের ১৩ অক্টোবর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

(কৃতজ্ঞতা স্বীকার : সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান, দ্বিতীয় খণ্ড, একতা)

ইলা মিত্রের পৈত্রিক ভিটে : ইতিহাস, সংগ্রাম বিস্মৃত এক ঐতিহ্যের ঠিকানা

সাজেদ রহমান

ঝিনাইদহ জেলার শৈলকূপা উপজেলার এক শান্ত, নির্জন গ্রামীণ পথ ধরে এগোলে;হাটফাজিলপুর থেকে উত্তর-পশ্চিমে কয়েক কিলোমিটার গেলে এমপি'র মোড় । সেখান থেকে দক্ষিণে সরু পথে দুই কিলোমিটার, তারপর পুব দিকে জিকে প্রজেক্টের খালের ধার ঘেঁষে আরও দেড় কিলোমিটার;দেখা মেলে দুটি পুরনো বাড়ি। আশপাশে বনে-জঙ্গলে ঘেরা নিস্তব্ধতা। বাড়ি দুটির একটি হাজী কিয়ামউদ্দীনের, অন্যটি পরিচিত হাফেজ সাহেবের বাড়ি নামে। এখন সেখানে বসবাস করেন তাদের উত্তরাধিকারীরা। সময়ের স্রোতে ভাটার টানে এই দুই ঘর আজ সাধারণ গ্রামীণ বাড়ি হিসেবেই দাঁড়িয়ে থাকলেও, এঁদের ভেতর লুকিয়ে আছে বাঙালির সংগ্রামী ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

এ বাড়িগুলোই একসময় ছিল বাংলার অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল নগেন্দ্রনাথ সেন ও তাঁর স্ত্রী মনোরমা সেনের বসতভিটে। সরকারি দায়িত্ব পালনে কলকাতা-কেন্দ্রিক জীবনযাপন করলেও তিনি নিয়মিত ফিরে আসতেন নিজের এই পৈত্রিক ভিটায়। সেখানেই শৈশবে এসেছেন তাঁর মেয়ে ইলা সেন;যিনি পরবর্তীকালে 'ইলা মিত্র' নামে পরিচিত হয়ে ওঠেন তেভাগা আন্দোলনের বীর নেত্রী হিসেবে। এই প্রত্যন্ত গ্রামে কাটানো শৈশব তাঁর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে যোগ করেছিল সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা, দুঃখ-বেদনা ও সংগ্রামের বাস্তব চিত্র;যা হয়তো পরে তাঁর বিপ্লবী চেতনার ভিত আরও মজবুত করেছিল।

নগেন্দ্রনাথ সেনের বিশাল ভূসম্পত্তি ছিল বাগুটিয়া এলাকায়। গ্রামটি নাম পেয়েছে;সম্ভবত 'বাগ' (বাগান বা জঙ্গলঘেরা অঞ্চল), 'টিয়া/উটিয়া' (বসতি বা ভূখণ্ড);এই গঠন থেকে; অর্থাৎ, ত্বাগানঘেরা বসতিদ অর্থবহ স্থাননামটিরই প্রতিফলন এখানে। সেই বাগানঘেরা বসতিই ছিল ইলা মিত্রের পূর্বপুরুষদের জীবনের কেন্দ্র।

কিন্তু দেশভাগের অস্থির সময় সম্পত্তির ভাগ্য বদলে যায়। নগেন্দ্রনাথ সেন কলকাতায় অবস্থান করায় তাঁর গোমস্তা কালীপদ চক্রবর্তী নামমাত্র মূল্যে বহু জমি বিক্রি করে দেন। সেই সুযোগে কিছু লোক বিপুল সম্পদ হাতিয়ে নেয়, যা আজও স্থানীয়দের মুখে মুখে শোনা যায় ইতিহাসের মতো। পরে তাঁর শাশুড়ি সরোদিনী সেনও কিছু জমি বিক্রি করেন;যেসব জমির মালিকানাও প্রকৃতপক্ষে তাঁর ছিল না। পাকিস্তান আমলে বাদশাহ মিয়া নামে এক পুলিশ কর্মকর্তার দখলে যায় সেন পরিবারের আরও অনেক জমি, যেখানে এখন দীঘি ও পুকুর খনন করে মাছচাষ করা হয়।

এই গ্রামেই দাঁড়িয়ে আছে এক অনন্য মহিয়সীর স্মৃতি। নাচোলের নারী-পুরুষের অধিকার রক্ষার সংগ্রামে 'রানী মা' হিসেবে পরম শ্রদ্ধায় যাকে স্মরণ করে সমগ্র ভারত উপমহাদেশ, সেই ইলা মিত্রের শেকড় লুকিয়ে আছে বাগুটিয়ার মাটিতে। অথচ পরিতাপের বিষয়;এখনো অধিকাংশ মানুষই জানেন না, তাদেরই গ্রামের এক পরিবারে জন্মেছিলেন এমন এক বিপ্লবী, যিনি তেভাগা আন্দোলনের ইতিহাসে এক অপরাজেয় নাম।

গতকাল তাঁর পৈত্রিক ভিটে দর্শণে গিয়েছিলাম। বাড়ির ভেতর গিয়ে দাঁড়ালাম। নীরবে শুধু স্মরণ করিয়ে দিল;ইতিহাস কখনো কখনো আমাদের হাতছাড়া হতে হতে বেঁচে থাকে কেবল ধুলোমাখা বাড়ির দেয়ালে, হারিয়ে যাওয়া নথির আড়ালে, কিংবা প্রবীণদের স্মৃতির ভাঁজে। তাই প্রশ্ন জাগে;যে নারী জীবনযুদ্ধের শেষ দিন পর্যন্ত সংগ্রাম করে গেছেন নিপীড়িত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায়, তাঁর এ ভিটে কি এভাবেই পড়ে থাকবে বেদখলে ?

স্বাধীন দেশের মানুষ হিসেবে আমাদের নৈতিক দায়িত্ব হলো ইতিহাসের প্রতি সম্মান জানানো, সেই সংগ্রামী মানুষের প্রতি দায় স্বীকার করা। তাই ইলা মিত্রের স্মৃতি রক্ষায় তাঁর পৈত্রিক ভিটে ও সম্পত্তি উদ্ধার করে একটি স্মৃতি কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হলে তা শুধু তাঁকে সম্মান জানানোই নয়;এই মাটির মানুষেরও গর্বের বিষয় হবে। আগামী প্রজন্ম জানতে পারবে এই মাটিই জন্ম দিয়েছে এক মহীয়সী বাঙালিকে, যিনি ছিলেন গণমানুষের বিপ্লব ও মুক্তির প্রতীক।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

পশ্চিম এশিয়ায় ডোনাল্ড ট্রাম্পের শান্তি প্রস্তাব হাস্যকর

সৌর বসু

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি যেখানেই যাচ্ছেন বিক্ষোভের সম্মুখীন হচ্ছেন। সম্প্রতি কুয়ালালামপুরে তিনি ASEAN সম্মেলনে যোগ দিতে এসেছিলেন। কুয়ালালামপুরে ইন্ডিপেন্ডেন্টস স্কোয়ারে এবং অন্যান্য জায়গায় ফিলিস্তিন পন্থীরা গাজায় শিশু নারী এবং নিরাপরাধ ফিলিস্তিন বাসীদের নির্বিচারে হত্যা করার জন্য তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানায়। শুধু কুয়ালালামপুরেই নয়, সমগ্র পৃথিবী জুড়ে এই নির্বিচার হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হচ্ছে। তার নিজের দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিগত দু'বছর ধরে মার্কিন মদতে গাজাতে ইসরাইল কর্তৃক নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করার বিরুদ্ধে জন সমাবেশ, বিক্ষোভ, গণ আন্দোলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিশিষ্ট লেখিকা এবং মানবাধিকার কর্মী অরুন্ধতী রয় কিছুদিন আগে লন্ডনে একটি পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বলেছিলেন যে ইসরাইল এবং আমেরিকা গাজা ভূখণ্ডের থেকে ফিলিস্তিনিদের নির্মূল করার জন্য নৃশংস আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। প্যালেস্টাইনের জমি ছিনিয়ে নিয়ে বসতি স্থাপন করে, ফিলিস্তিনিদের তাদের ভূখণ্ড থেকে উৎখাত করে চলেছে। ইসরাইলিরা সকল প্রকার শালীনতা বোধ হারিয়ে ফেলে, সামাজিক মাধ্যমে বিকৃত ভিডিও প্রকাশ করে তাদের নৃশংসতাকে ন্যায্যতা প্রদান করার কাজে লিপ্ত হয়েছে। ইজরায়েলের জায়নবাদী বা জিওনিস্টরা বিশ্বাস করে প্যালেস্টাইনে তাদের জন্মগত অধিকার।

ফিলিস্তিনিওদের অমানবিকভাবে উচ্ছেদ করে নির্মমভাবে হত্যা করে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে তাই তাদের কোন বিবেক দংশন নেই। ইসরায়েলে প্রধানমন্ত্রী মেনাকুম বিন (Manakum Bin) ফিলিস্তিনি ওদের দু পায়ী জন্তু বলেছিলেন, ইয়াক রবিন বলেছিলেন গ্রাস হপার বা ফড়িং এবং গোল্ডা মেয়ার বলেছিলেন, ফিলিস্তিনিওদের কোন অস্তিত্বই নেই। ১৯১৭ সালে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী বেলফ্যো ঘোষণা করেন যে পশ্চিম এশিয়াতে ইহুদিদের জন্য ন্যাশনাল হোম গড়ে দিতে তারা দায়বদ্ধ। এরপর থেকেই প্যালেস্টাইনে ইহুদিরা বসতি গড়তে শুরু করে।

ফিলিস্তিনিওরা তখন এর তীব্র প্রতিবাদ করেছিল। সেই সময় প্যালেস্টাইনে জনসংখ্যার শতকরা ৯০ শতাংশ ছিল ফিলিস্তিনি এবং ইহুদিদের সংখ্যা ছিল নগণ্য। তখন থেকে ইহুদীদের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে পেতে ১৯৩৫ সালে ৩৭ শতাংশে এসে দাঁড়ায়।

১৯৪৮ সালে প্যালেস্টাইনে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হল। জাতিসংঘের প্রস্তাব ছিল প্যালেস্টাইনে দুটি রাষ্ট্র গঠিত হবে। একটি আরবদের জন্য এবং একটি ইহুদিদের জন্য। কিন্তু দেখা গেল ইহুদিদের জন্য ইসরাইল গঠিত হলেও আরবদের জন্য কোন রাষ্ট্র গঠিত হলো না। এখান থেকেই বিবাদের সূত্রপাত। ১৯৬৭ সালে ইজরায়েল অতর্কিতে মিশর ,জর্ডান আক্রমণ করে এবং গোলানহাইটস ও গাজা দখল করে বসে। এই যুদ্ধের পর থেকেই জর্ডান নদীর পশ্চিম তীরে গাজা ভূখণ্ডে ইহুদিরা বসতি স্থাপন করতে শুরু করে। আজকে সেখানে প্রায় সাত লক্ষ ইহুদীরা জমি অধিকার করে বসে আছে। পশ্চিম তীরে বসবাসকারী ফিলিস্তিনিওদের সংখ্যা প্রায় ৩০ লক্ষ। ফিলিস্তিনিওরা সেখানে আজ উদ্বাস্তু হয়ে ঘেটোতে , তাঁবুতে বাস করছে। ফিলিস্তিনিওদের জন্ম ভিটে থেকে তাদের উৎখাত করে দেওয়া হলে, পশ্চিম এশিয়ায় তাদের জন্য আর কোন ভূখণ্ডই অবশিষ্ট থাকবে না। লোহিত সাগরে তাদের সলিল সমাধি ঘটবে।

ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিস পশ্চিম তীরে ইসরাইলিদের বসবাস কে অবৈধ বলে ঘোষণা করেছে। কিন্তু তৎসত্বেও ইসরাইলিরা পশ্চিম তীর দখল করে চলেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশগুলি ইসরাইলের দখলদারিকে মদত যুগিয়ে যাচ্ছে।

আজ থেকে দুবছর আগে প্যালেস্টাইনের সন্ত্রাসবাদি সংগঠন হামাস অতর্কিতে ইসরাইল আক্রমণ করে। প্রায় ১২শ অসামরিক মানুষ এই আক্রমণে নিহত হয়, অনেক মানুষ পঙ্গু হয়ে পড়ে। হামাসের আক্রমণের নিন্দায় সমগ্র বিশ্ব মুখরিত হয়ে ওঠে। এরপরেই ইসরাইল বিগত দু বছর ধরে ফিলিস্তিনয়দের উপর নৃশংস আক্রমণ চালায়। বিগত দু বছরে ষাট হাজারের বেশি নিরীহ মানুষকে হত্যা করে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী। শিশু এবং নারীরাও ইসরাইলি সেনাবাহিনীর হাত থেকে রক্ষা পায়নি। ইসরাইলি বিমান গুড়িয়ে দিয়েছে, স্কুল বাড়ি, হাসপাতাল, সাধারণ নাগরিকদের বাসস্থান। পৃথিবীর অনেক দেশে এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। কিন্তু ইসরাইলদের এই হত্যাকাণ্ডে মদত দিয়ে চলেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র । আমেরিকা অর্থ সাহায্য এবং সমরাস্ত্র পাঠানো বন্ধ করলে যুদ্ধ থেমে যাবে। কিন্তু নোবেল শান্তি পুরস্কারের অভিলাষী ডোনাল্ড ট্রাম্প সে পথে না গিয়ে গাজা শান্তি চুক্তি প্রস্তাব পেশ করেছে।

২০২৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হামাস কর্তৃক ইসরাইল আক্রমণের পর ২১ বিলিয়ন ডলারের আর্থিক এবং সামরিক অস্ত্র ইসরাইলকে সহায়তা করেছে। এই সহায়তা ছাড়া ইসরাইলের পক্ষে হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালানো সম্ভব ছিল না। এছাড়াও সম্প্রতি গাজাতে শান্তি

চুক্তির প্রস্তাবের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ,ইসরাইলে ৬ বিলিয়ন ডলার অস্ত্র সাহায্যের প্রস্তাব মার্কিন কংগ্রেসে পেশ করেছে। ট্রাম্প প্রশাসন একইসঙ্গে গজাতে শান্তি চুক্তি পেশ করছে এবং ইসরাইলকে যুদ্ধে মদত যোগাচ্ছে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিচারিতা আজ সর্বসমক্ষে ফাঁস হয়ে গিয়েছে। ইয়োরোপের শক্তিশালী রাষ্ট্র বৃটেন ফ্রান্স সম্প্রতি প্যালেস্টাইনকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং তা নিয়ে দেশি বিদেশি সংবাদপত্রে অনেক শব্দ ব্যয় করা হচ্ছে। কিন্তু এ কথা মনে রাখা জরুরী যে, এই পুঁজিবাদী দেশগুলি প্যালেস্টাইনে, ইসরাইলের নির্বিচার বোমাবর্ষণ করে ৬৭হাজার নারী শিশু সহ সাধারণ মানুষকে হত্যা করেছে। তৎসত্বেও এই পুঁজিবাদী দেশগুলি এই হত্যাকাণ্ডেকে ,গণহত্যা বা জেনোসাইড বলতে রাজি নয়। মনে রাখতে হবে এই দেশগুলিই প্যালেস্টাইনকে , ইহুদিদের স্বদেশভূমির প্রতি দায়বদ্ধতার অজুহাত দিয়ে, ফিলিস্তিনিয়দের , তাদের জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত করার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এতদিন ধরে প্যালেস্টাইনে গণহত্যা সংঘটিত করতে পরোক্ষে মদত দিয়ে এসেছে।

পশ্চিম এশিয়ার এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প, গাজা শান্তি চুক্তির অবতারণা করেছেন। এই চুক্তিতে ৬টি অনুচ্ছেদ আছে। প্রথমত চুক্তিটিতে যুদ্ধবিরতি এবং উভয় পক্ষের তরফে যুদ্ধ বন্দীদের (জীবিত ও মৃত)ছেড়ে দেবার কথা বলা আছে। দ্বিতীয়ত ত্রাণ ও পুনর্গঠনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া জল, হাসপাতাল ,জল নিষ্কাশন প্রভৃতির ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয় উল্লিখিত আছে। এই কাজ গুলো রাষ্ট্র সংঘের মতো নিরপেক্ষ সংস্থার তত্ত্বাবধানে সংঘটিত করতে হবে।

গাজার প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ প্যালেস্টাইন কমিটির হাতে থাকলেও, ট্রাম্পের নেতৃত্বে একটি আন্তর্জাতিক বোর্ড সমগ্র এলাকার উপর নজরদারি চালাবে। আন্তর্জাতিক এই বোর্ডের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ সকলেই ডোনাল্ড ট্রাম্পের আজ্ঞাবহ। অর্থাৎ গাজার প্রকৃত কর্তৃত্ব ট্রাম্প এবং তার পারিষদবৃন্দের উপর ন্যস্ত থাকবে। গাজার অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একটি বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকা স্থাপন করা হবে। কর্মসংস্থান এবং আন্তর্জাতিক বিনিয়োগের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পাবে। হামাসকে অস্ত্রসমর্পণ করতে হবে এবং প্রশাসনিক ব্যাপারে তাদের কোন ভূমিকা থাকবে না। গাজায় শান্তি স্থাপিত হলে ইসরায়েলী প্রতীরক্ষা বাহিনী ধীরে ধীরে তুলে নেওয়া হবে। কিন্তু এর জন্য কোন সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়নি। এই শান্তি প্রস্তাবে আশ্চর্যজনকভাবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কোন ভূমিকা নেই। গাজাতে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে কোন উল্লেখ এই প্রস্তাবে নেই। উল্লেখ নেই নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার। গজাতে যে নির্বিচার হত্যা করেছে ইজরায়েল সৈন্যরা ,যাকে ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিস গণহত্যা বলে অভিহিত করেছে তার বিচারের কোন উল্লেখ নেই এই প্রস্তাবে। গাজাতে ইসরাইলি সৈন্যরা বোমাবর্ষণ করে গাজা ভূখণ্ডকে প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে। তার ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে নিশ্চুপ এই প্রস্তাব। পশ্চিম এশিয়ার ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রদূত Talmiz Ahmad ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই শান্তি প্রস্তাবকে হাস্যকর বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। তার মতে ১৯৯০ এর দশকে অসলো প্রস্তাবের পর ইসরাইল- আরবদের মধ্যেকার সমস্যা নিয়ে কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব এখনো অবধি পেশ করা হয়নি। জর্ডান নদীর পশ্চিম তীরে ইজরায়েলী আধিপত্যর ব্যাপারে কোন দিক নির্দেশ নেই এই প্রস্তাবে। প্রকৃতপক্ষে অনেক সন্ধি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে অসলো প্রস্তাবের পর। কিন্তু কোন সুরাহা হয়নি। এই বছর জানুয়ারি মাসে ডোনাল্ড ট্রাম্প একটি যুদ্ধ বিরোধী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তিনটি পর্যায়ে এই প্রস্তাব বাস্তবায়িত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ইসরাইলের প্রেসিডেন্ট নেতানিয়াহু এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই নেতানিয়াহু এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। বস্তুত তিনি নিজেকে গুটিয়ে নেন। আশ্চর্যের বিষয় নেতানেয়াহুর এই পশ্চাদপসরণ সত্ত্বেও ডোনাল্ড ট্রাম্প তাকে কোনভাবে দোষারোপ করেননি। ইসরাইল এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের মনে হয় অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল। প্রকৃতপক্ষে প্যালেস্টাইনে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের ব্যাপারে ইসরাইলের তীব্র আপত্তি। ইসরাইল সমগ্র অঞ্চলটি তাদের নিয়ন্ত্রণে রেখে একটি মাত্র রাষ্ট্র গঠন করতে চায়। ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিস এবং ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্ট ইসরাইলের বিরুদ্ধে গণ হত্যার অভিযোগ আনলেও ইসরাইল তাকে কোন গুরুত্ব দিতে চায় না। ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিস এবং ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্টের ইসরাইলের কেশাগ্র স্পর্শ করারও কোন ক্ষমতা নেই। ইসরাইল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমগ্র আইনের ঊর্ধ্বে। প্যালেস্টাইনকে রাষ্ট্র হিসাবে , কে স্বীকৃতি জানালো সে ব্যাপারেও তাদের কিছু যায় আসে না। বিগত দু বছরে ইসরাইল ৬৫ হাজার ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে। ফিলিস্তিনিদের হাতে দুজন ইসরাইলি মারা গেলে ইসরাইলের সৈন্য ২০০ ফিলিস্তিনি হত্যা করে। কিন্তু একথা স্মরণে রাখা দরকার গণহত্যার মাধ্যমে দেশপ্রেমকে দমিয়ে রাখা যায় না। গণহত্যা একটি আকাঙ্ক্ষাকে একটি আইডিয়াকে ধ্বংস করতে পারে না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ছ বছরে নাৎসিরা ৬০ লক্ষ ইহুদি কে হত্যা করে। ইউরোপ থেকে ইহুদি সম্প্রদায়ের দুই তৃতীয়াংশ জনসংখ্যা মুছে যায়। তৎ সত্বেও কয়েক বছরের মধ্যে ইহুদিদের জন্য

একটি রাষ্ট্র গঠিত হয় এবং ইহুদিরা বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী সম্প্রদায় হিসাবে আবির্ভূত হয়।

ইহুদিদের উপর যে অত্যাচার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হয়েছে, তার থেকে তারা কোন শিক্ষা গ্রহণ করেনি। প্যালেস্টাইন অধিবাসীদের উপর নাৎসিদের মতো একই ধরনের অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে ইহুদিরা। প্যালেস্টাইনের ফিলিস্তিনিওদের গণতান্ত্রিক অধিকারকে তারা বোমা বর্ষণের মাধ্যমে গুড়িয়ে দিতে চাইছে। এখনো গাজা ভূখণ্ডে ২০ থেকে ২৫ লক্ষ ফিলিস্তিনেও আছে, যাদের সংখ্যা ইহুদিদের থেকে বেশি। বোমা বর্ষণ করেও জনবিন্যাস পরিবর্তন করা যায়নি। ফিলিস্তিনিওদের দেশ ভক্তির মানসিকতাও গণ হত্যার মাধ্যমে পরিবর্তিত হবে না। তাদের মননে রয়েছে একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। শক্তি প্রয়োগ করে এই আকাঙ্ক্ষাকে ধুলিস্যাৎ করা সম্ভব নয়। ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং নেতানিয়াহু সহ ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার আধিপত্যবাদী এবং দমনমূলক মানসিকতার একদিন পরাজয় ঘটবেই।

বাংলাদেশ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধর শেষ পর্বে জামাত , রাজাকার, আলবদরদের সাহায্যে পাক সেনাদের নৃশংস ও পাশবিকভাবে বুদ্ধিজীবী হত্যা

[পৃথিবীর দেশে দেশে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে মুক্তিকামী মানুষের সংগ্রামের ইতিহাসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের এক অনন্য স্থান আছে। অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে (৯ মাস) এই বিজয় অর্জিত হয়েছিল। কিন্তু তার জন্য ওই দেশের মানুষের চড়া মূল্য দিতে হয়েছিল।পাক সেনারা তাদের দেশীয় অনুচরদের সহায়তায় ৩০ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছিল। ধর্ষণ করেছিল ২ লক্ষাধিক মা , বোনকে। তাদের এই হত্যাকাণ্ডের অন্যতম লক্ষ্য ছিল দেশের বুদ্ধিজীবী সমাজকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া। Ethnic Cleansing – অর্থাৎ দেশকে হিন্দু শূন্য করা এবং আওয়ামী লীগ ও কমিউনিস্টদের নির্বিচারে হত্যা করা। পাক সেনারা পরাজয়ের ঠিক আগে শেষবারের মতন ঢাকা শহরে যে নারকীয় হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল তারই সংক্ষিপ্ত কাহিনী এখানে রাখা হল। এই বিশেষ প্রতিবেদনটি ' মতামত ' এর মুখ বই থেকে সংগৃহীত।]

বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড বলতে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময়টুকুতেই পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী কর্তৃক পরিকল্পিতভাবে বাংলাদেশের জ্ঞানী-গুণী ও মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের হত্যা করাকে বুঝায়। ১৯৭১ এর ডিসেম্বর মাসে স্বাধীনতা যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে এসে পাকিস্তানী বাহিনী যখন বুঝতে শুরু করে যে তাদের পক্ষে যুদ্ধে জেতা সম্ভব না, তখন তারা নবগঠিত দেশকে সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও শিক্ষাগত দিক থেকে দুর্বল এবং পঙ্গু করে দেওয়ার জন্য পরিকল্পনা করতে থাকে। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৪ ডিসেম্বর রাতে পাকিস্তানি বাহিনী তাদের দেশীয় দোসর রাজাকার, আলবদর ও আল শামস বাহিনীর সহায়তায় দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের নিজ নিজ গৃহ হতে তুলে এনে নির্মম নির্যাতনের পর হত্যা করে। এই পরিকল্পিত গণহত্যাটি বাংলাদেশের ইতিহাসে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড নামে পরিচিত। বন্দী অবস্থায় বুদ্ধিজীবীদের বিভিন্ন বধ্যভূমিতে হত্যা করা হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাদের ক্ষত-বিক্ষত ও বিকৃত লাশ রায়েরবাজার এবং মিরপুর বধ্যভূমিতে পাওয়া যায়। অনেকের লাশ শনাক্তও করা যায়নি, পাওয়াও যায়নি বহু লাশ। ১৯৭১ এর ১৪ ডিসেম্বরের নির্মম হত্যাকাণ্ডের কথা স্মরণ করে প্রতিবছর ১৪ ডিসেম্বর বাংলাদেশে পালিত হয় শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস। বুদ্ধিজীবী হত্যার স্মরণে বাংলাদেশের ঢাকায় বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ ডাকবিভাগ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে একটি স্মারক ডাকটিকিটের সিরিজ বের করেছে।

বুদ্ধিজীবীর সংজ্ঞা

প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী যারা দৈহিক শ্রমের বদলে মানসিক শ্রম বা বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রম দেন তারাই বুদ্ধিজীবী। বাংলা একাডেমি প্রকাশিত শহীদ বুদ্ধিজীবী কোষ গ্রন্থে বুদ্ধিজীবীদের যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে তা হলো :

বুদ্ধিজীবী অর্থ লেখক, বিজ্ঞানী, চিত্রশিল্পী, কণ্ঠশিল্পী, সকল পর্যায়ের শিক্ষক, গবেষক, সাংবাদিক, রাজনীতিক, আইনজীবী, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, স্থপতি, ভাস্কর, সরকারি ও বেসরকারি কর্মচারী, চলচ্চিত্র ও নাটকের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, সমাজসেবী ও সংস্কৃতিসেবী।

কারণ

যুদ্ধের পরপরই রায়েরবাজার বধ্যভূমি থেকে তোলা ছবিতে বুদ্ধিজীবীদের লাশ দেখা যাচ্ছে।

পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র গঠনের পর থেকেই বাঙালিদের বা পূর্ব-পাকিস্তানিদের সাথে পশ্চিম-পাকিস্তানের রাষ্ট্র-যন্ত্র বৈষম্যমূলক

আচরণ করতে থাকে। তারা বাঙালিদের ভাষা ও সংস্কৃতির উপর আঘাত হানে। এরই ফলশ্রুতিতে বাঙালির মনে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হতে থাকে এবং বাঙালিরা এই অবিচারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন শুরু করে। এ সকল আন্দোলনের নেতৃত্বে থাকতেন সমাজের সর্বস্তরের বুদ্ধিজীবীরা। তাঁরা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক-ভাবে বাঙালিদের বাঙালি জাতীয়তা-বোধে উদ্বুদ্ধ করতেন। তাঁদের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ফলেই জনগণ ধীরে ধীরে নিজেদের দাবি ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে থাকে যা পরবর্তীতে তাদের রাজনৈতিক আন্দোলনের দিকে ধাবিত করে। এজন্য শুরু থেকেই বুদ্ধিজীবীরা পাকিস্তানের সামরিক শাসকদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিলেন। তাই যুদ্ধের শুরু থেকেই পাকিস্তানি বাহিনী বাছাই করে করে বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করতে থাকে। এছাড়া যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে যখন পাকিস্তানের পরাজয় যখন শুধু সময়ের ব্যাপার তখন বাঙালি জাতি যেন শিক্ষা, সাংস্কৃতিক ও সামাজিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে তাই তারা বাঙালি জাতিকে মেধা-শূন্য করে দেবার লক্ষ্যে তালিকা তৈরি করে বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে। এ প্রসঙ্গে শহীদ বুদ্ধিজীবী কোষ গ্রন্থে যে যুক্তিটি দেয়া হয়েছে তা প্রাসঙ্গিক ও যুক্তিযুক্ত:-এটা অবধারিত হয়, বুদ্ধিজীবীরাই জাগিয়ে রাখেন জাতির বিবেক, জাগিয়ে রাখেন তাদের রচনাবলির মাধ্যমে, সাংবাদিকদের কলমের মাধ্যমে, গানের সুরে, শিক্ষালয়ে পাঠদানে, চিকিৎসা, প্রকৌশল, রাজনীতি ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণের সান্নিধ্যে এসে। একটি জাতিকে নির্বীজ করে দেবার প্রথম উপায় বুদ্ধিজীবীশূন্য করে দেয়া। ২৫ মার্চ রাতে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল অতর্কিতে, তারপর ধীরে ধীরে, শেষে পরাজয় অনিবার্য জেনে ডিসেম্বর ১০ তারিখ হতে ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে দ্রুতগতিতে।

হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনা

মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলি, পাকিস্তানি বাহিনীর পক্ষে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের মূল পরিকল্পনাকারী

২৫ মার্চ রাতে অপারেশন সার্চলাইটের পরিকল্পনার সাথে একসাথেই বুদ্ধিজীবীদের হত্যার পরিকল্পনা করা হয়। পাকিস্তানি সেনারা অপারেশন চলাকালে খুঁজে-খুঁজে বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করতে থাকে।৩৫গ্ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষককে ২৫শে মার্চের রাতেই হত্যা করা হয়। তবে, পরিকল্পিত হত্যার ব্যাপক অংশটি ঘটে যুদ্ধ শেষ হওয়ার মাত্র কয়েকদিন আগে। যুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এবং তাদের প্রশিক্ষিত আধা-সামরিক বাহিনী আল-বদর এবং আল-শামস বাহিনী একটি তালিকা তৈরি করে, যেখানে এই সব স্বাধীনতাকামী বুদ্ধিজীবীদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়।৩৬গ্ন ধারণা করা হয় পাকিস্তানি বাহিনীর পক্ষে এ কাজের মূল পরিকল্পনাকারী ছিলেন মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলি।৩৭গ্ন কারণ স্বাধীনতার পর ধ্বংসপ্রাপ্ত বঙ্গভবন থেকে তাঁর স্বহস্তে লিখিত ডায়েরি পাওয়া যায় যাতে অনেক নিহত ও জীবিত বুদ্ধিজীবীর নাম পাওয়া যায়।৩৮গ্ন এছাড়া আইয়ুব শাসনামলের তথ্য সচিব আলতাফ গওহরের এক সাক্ষাৎকার হতে জানা যায় যে, ফরমান আলীর তালিকায় তাঁর বন্ধু কবি সানাউল হকের নাম ছিল। আলতাফ গওহরের অনুরোধক্রমে রাও ফরমান আলি তার ডায়েরির তালিকা থেকে সানাউল হকের নাম কেটে দেন। এছাড়া আল-বদরদের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা তিনিই করেছিলেন বলে তার ডায়েরিতে একটি নোট পাওয়া যায়।

এছাড়া তার ডায়েরিতে হেইট ও ডুসপিক নামে দুজন মার্কিন নাগরিকের কথা পাওয়া যায়। এদের নামের পাশে ইউএসএ এবং ডিজিআইএস লেখা ছিল। এর মধ্যে হেইট ১৯৫৩ সাল থেকে সামরিক গোয়েন্দা-বাহিনীতে যুক্ত ছিলেন এবং ডুসপিক ছিলেন সিআইএ এজেন্ট।৩৩গ্ন এ কারণে সন্দেহ করা হয়ে থাকে, পুরো ঘটনার পরিকল্পনায় সিআইএ'র ভূমিকা ছিল।

হত্যাকাণ্ডের বিবরণ

ডিসেম্বরের ৪ তারিখ হতে ঢাকায় নতুন করে কারফিউ জারি করা হয়। ডিসেম্বরের ১০ তারিখ হতে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের প্রস্তুতি নেওয়া হতে থাকে। মূলত ১৪ ডিসেম্বর পরিকল্পনার মূল অংশ বাস্তবায়ন হয়। অধ্যাপক, সাংবাদিক, শিল্পী, প্রকৌশলী, লেখক-সহ চিহ্নিত বুদ্ধিজীবীদের পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং তাদের দোসরেরা অপহরণ করে নিয়ে যায়। সেদিন প্রায় ২০০ জনের মতো বুদ্ধিজীবীদের তাদের বাসা হতে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁদের চোখে কাপড় বেঁধে মিরপুর, মোহাম্মদপুর, নাখালপাড়া, রাজারবাগসহ অন্যান্য আরও অনেক স্থানে অবস্থিত নির্যাতন কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাদের উপর বীভৎস নির্যাতন চালানো হয়। পরে তাদের নৃশংসভাবে রায়েরবাজার এবং মিরপুর বধ্যভূমিতে হত্যা করে ফেলে রাখা হয়।

মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে গণকবর

এমনকি, আত্মসমর্পণ ও যুদ্ধের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তির পরেও পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এবং তার সহযোগীদের গোলাগুলির অভিযোগ পাওয়া যায়। এমনই একটি ঘটনায়, ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসের ৩০ তারিখ স্বনামধন্য চলচ্চিত্র-নির্মাতা জহির

রায়হান প্রাণ হারান। এর পেছনে সশস্ত্র বিহারীদের হাত রয়েছে বলে সন্দেহ করা হয়। নিহত বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে প্রতি বছর ডিসেম্বরের ১৪ তারিখ 'শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস' হিসেবে পালন করা হয়।

জড়িত ব্যক্তিবর্গ

পাকিস্তানি সামরিক জান্তার পক্ষে এ হত্যাকাণ্ডের মূল পরিকল্পনাকারী ছিল মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী।। ১৬ ডিসেম্বরের পর আশরাফুজ্জামান খানের নাখালপাড়ার বাড়ি থেকে তার একটি ব্যক্তিগত ডায়েরি উদ্ধার করা হয়, যার দুটি পৃষ্ঠায় প্রায় ২০ জন বুদ্ধিজীবীর নাম ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের কোয়ার্টার নম্বরসহ লেখা ছিল। তার গাড়ির ড্রাইভার মফিজুদ্দিনের দেয়া সাক্ষ্য অনুযায়ী রায়ের বাজারের বিল ও মিরপুরের শিয়ালবাড়ি বধ্যভূমি হতে বেশ কয়েকজন বুদ্ধিজীবীর গলিত লাশ পাওয়া যায়, যাদের সে নিজ হাতে গুলি করে মেরেছিল। এছাড়া আরও ছিলেন এ বি এম খালেক মজুমদার (শহীদুল্লাহ কায়সারের হত্যাকারী), মাওলানা আবদুল মান্নান (ডাঃ আলীম চৌধুরীর হত্যাকারী), প্রমুখ। তবে চট্টগ্রামের ফজলুল কাদের চৌধুরী তার এলাকা চট্টগ্রামের কয়েকটি অঞ্চল পাকিস্তানীদের প্রভাবমুক্ত রাখতে যথেষ্ট সফল হন।

হত্যার পরিসংখ্যান

বাংলাপিডিয়া হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বুদ্ধিজীবীদের সংখ্যা নিম্নরূপ:

শিক্ষাবিদ ৯৯১

সাংবাদিক ১৩

চিকিৎসক ৪৯

আইনজীবী ৪২

অন্যান্য (সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, শিল্পী এবং প্রকৌশলী) ১৬

নিহত বুদ্ধিজীবীদের তালিকা

২৫শে মার্চ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত বেশ কয়েকজন স্বনামধন্য বুদ্ধিজীবী পাকবাহিনীর হাতে প্রাণ হারান। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন :

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক —

গোবিন্দ চন্দ্র দেব (দর্শনশাস্ত্র)

মুনীর চৌধুরী (বাংলা সাহিত্য)

মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী (বাংলা সাহিত্য)

আনোয়ার পাশা (বাংলা সাহিত্য)

আবুল খায়ের (ইতিহাস)

জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা (ইংরেজি সাহিত্য)

সিরাজুল হক খান (শিক্ষা)

এ এন এম ফাইজুল মাহী (শিক্ষা)

হুমায়ূন কবীর (ইংরেজি সাহিত্য)

রাশিদুল হাসান (ইংরেজি সাহিত্য)

সাজিদুল হাসান (পদার্থবিদ্যা)

ফজলুর রহমান খান (মৃত্তিকা বিজ্ঞান)

এন এম মনিরুজ্জামান (পরিসংখ্যান)

মোঃ আব্দুল মুক্তাদির (ভূ-বিদ্যা)

শরাফত আলী (গণিত)

আতাউর রহমান খান খাদিম (পদার্থবিদ্যা)

অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্য (ফলিত পদার্থবিদ্যা)

এম সাদেক (শিক্ষা)

মোহাম্মদ সাদত আলী (শিক্ষা)

সন্তোষচন্দ্র ভট্টাচার্য (ইতিহাস)

গিয়াসউদ্দিন আহমদ (ইতিহাস)

রাশীদুল হাসান (ইংরেজি)

মোহাম্মদ মুর্তজা (চিকিৎসক)

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক

হবিবুর রহমান (গণিত বিভাগ)

সুখরঞ্জন সমাদ্দার (সংস্কৃত)

মীর আবদুল কাইউম (মনোবিজ্ঞান)

চিকিৎসক

মোহাম্মদ ফজলে রাব্বি (হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ)

আব্দুল আলিম চৌধুরী (চক্ষু বিশেষজ্ঞ)

শামসুদ্দীন আহমেদ

হুমায়ুন কবীর

আজহারুল হক

সোলায়মান খান

আয়েশা বদেরা চৌধুরী

কসির উদ্দিন তালুকদার

মনসুর আলী

মোহাম্মদ মোর্তজা

মফিজউদ্দীন খান

জাহাঙ্গীর

নুরুল ইমাম

এস কে লালা

হেমচন্দ্র বসাক

ওবায়দুল হক
আসাদুল হক
মোসাব্বের আহমেদ
আজহারুল হক (সহকারী সার্জন)
মোহাম্মদ শফী (দন্ত চিকিৎসক)

অন্যান্য

শহীদুল্লাহ কায়সার (সাংবাদিক)
নিজামুদ্দীন আহমেদ (সাংবাদিক)
সেলিনা পারভীন (সাংবাদিক)
সিরাজুদ্দীন হোসেন (সাংবাদিক)
এ এন এম গোলাম মোস্তফা (সাংবাদিক)
আলতাফ মাহমুদ (গীতিকার ও সুরকার)
ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত (রাজনীতিবিদ)
রণদাপ্রসাদ সাহা (সমাজসেবক এবং দানবীর)
যোগেশচন্দ্র ঘোষ (শিক্ষাবিদ, আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক)
মেহেরুন নেসা (কবি)
আবুল কালাম আজাদ (শিক্ষাবিদ, গণিতজ্ঞ)
নজমুল হক সরকার (আইনজীবী)
নূতন চন্দ্র সিংহ (সমাজসেবক, আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক)
রমণীকান্ত নন্দী (চিকিৎসক ও সমাজসেবক)

বধ্যভূমির সন্ধান

শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধের পূর্ব- দক্ষিণ পাশের অংশ । বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন বধ্যভূমি খোঁজার জন্য ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ ডিসেম্বর থেকে অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে ওয়ার ক্রাইমস ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটি। সারা দেশে প্রায় ৯৪২টি বধ্যভূমি শনাক্ত করতে পেরেছে তারা। স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন প্রকাশিত পত্রিকা, এ বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধ-নিবন্ধ, গ্রন্থ, এবং মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবার এবং স্থানীয় লোকজনদের সঙ্গে কথা বলে এসব বধ্যভূমি খুঁজে বের করা সম্ভব হয়েছে। প্রত্যেক বধ্যভূমিতে ফলক স্থাপনের পরিকল্পনা হচ্ছে। অধিকাংশ জেলাতেই মুক্তিযুদ্ধের বধ্যভূমিগুলো হয় রেলের নয়তো সড়ক ও জনপথের আওতাভুক্ত জায়গায়। তথ্যসূত্র -- উইকিপিডিয়া !!

কৃতজ্ঞতা -- Motamot – মতামত ।

পটভূমি ১৯৭১ দুটি অবিস্মরণীয় উপন্যাসের কথা

ফরিদ আহমেদ

সীমান্ত অতিক্রম করতেই গুপ্তচর সন্দেহে তাঁকে ধরে ফেলে কয়েকজন তরুণ। ওই তরুণদের অবশ্য দোষ দেওয়া যায় না। পূর্ব বাংলা থেকে প্রতিদিনই জান বাঁচাতে পালিয়ে আসছে লক্ষ লক্ষ মানুষ। পাকিস্তান আর্মি ওখানে এক চরম নারকীয় পরিবেশ তৈরি করেছে। সাধারণ মানুষ প্রাণভয়ে পালাচ্ছে। এদের সাথে সুযোগ বুঝে পাকিস্তানি গুপ্তচররাও ঢুকে পড়ছে ভারতে।

যে লোককে ওই তরুণোরা আটকেছে, সেই লোক গুপ্তচর হিসাবে আদর্শ। তাঁর চোখ অবিকল বেড়ালের চোখের মতো ঘোলা। খয়েরি রঙের গোল ঘেরের মধ্যে মণি দুটো ঠিক কালো নয়, ঈষৎ নীলচে। বেড়ালের চোখ যেমন আলোতে নিষ্প্রভ হয়ে আসে, আর অন্ধকার হলেই জ্বলজ্বলে হয়ে জ্বলে ওঠে, তাঁর চোখ দুটোও ঠিক তেমনি। পিঙ্গলাভ গোল তারা দুটোর মধ্যে মণি দুটো যেনো আলোর ছটা পাওয়া কালো পাথর। লোকটার নাক খাড়া, লম্বা ধরনের মুখ, পাকানো শরীর। লম্বায় প্রায় পৌনে ছ'ফুট। গড়পড়তা বাঙালিদের চেয়ে উচ্চতায় অনেক বেশি। বুকের ছাতিখানা প্রশস্ত। গায়ের রঙ তামাটের চেয়ে কালো হলেও, গলা ও চিবুকের ভাঁজের রেখায় এক কালের ফর্সা রঙের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়। পূর্ব বাংলার শ্যামবর্ণ এবং কৃষ্ণবর্ণ মানুষের সাথে তাঁর অমিল খুব বেশি দৃশ্যমান। ফলে, তাঁকে গুপ্তচর ভাবাটাই স্বাভাবিক ছিলো পশ্চিম বাংলার তরুণদের কাছে।

গুপ্তচর সন্দেহে কাউকে ধরলে শুরুতেই সাধারণত তাকে মারধোর করা হয়। এটা হচ্ছে প্রাথমিক আপ্যায়ন। কাউকে কাউকে পিটিয়ে ফেরেও ফেলা হয়। এই ব্যক্তির ক্ষেত্রে অবশ্য তা ঘটলো না। না ঘটার মূল কারণ হচ্ছে তাঁর সাথে থাকা রুগ্ন একটা কালো মেয়ে। মেয়েটা প্রায় বেহুশ। তাঁর চলবার শক্তিও ছিলো না। ওই লোকটাই তাঁকে এক রকম বয়ে নিয়ে এসেছে সীমান্তের এপারে। এ রকম একজন পরোপকারী মানুষকে গুপ্তচর হিসাবে সন্দেহ হয়তো করা যায়, কিন্তু পিটাতে গেলে বিবেকে বাঁধে। তরুণরা তাই তাঁকে না পিটিয়ে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে।

পুলিশ লোকটাকে জেরা করে। সেই জেরা থেকে জানা যায় লোকটার আসল নাম ডেভিড আর্মস্ট্রং। যদিও পাকিস্তানে তিনি মনসুর আলী নামে পরিচিত। ভদ্রলোক অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান। বাবা

বিলেতি, মা বাঙালি। কোলকাতায় জন্ম তাঁর। পাকিস্তান সৃষ্টি হবার পরে বাবা ও মায়ের চাকরি কারণে তাঁর পরিবার পশ্চিম পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলো। সেখানেই কেটেছে অনেকগুলো বছর। গানের প্রতি ডেভিডের টান ছিলো। উর্দু গজল গাইতেন তিনি। এই গান গাইতে গিয়েই মনসুর আলী নাম নেন তিনি। হয়ে ওঠেন একজন পশ্চিম পাকিস্তানি।

পশ্চিম পাকিস্তানে বেশ কয়েক বছর কাটানোর পরে হুট করেই পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসেন তিনি। এখানে এসে আরেকবার বদল ঘটে তাঁর। এখানে এসে এদেশের মানুষ হয়ে যান তিনি। একদিন তাঁর মনে হয় তিনি আসলে বাঙালি। বাংলার রোদ, জল আর বাতাসে তাঁর গায়ের রঙ পুড়ে তামাটে হতে শুরু করে। ডাল ভাত মাছ আর লঙ্কা ভালো লাগতে শুরু করে। বাঙালি মায়ের কারণে এমনিতেই বাংলা কিছুটা জানা ছিলো তাঁর। সেটা ঝালাই হয়ে একেবারে নিখুঁত হয়ে ওঠে। ভাটিয়ালি গান শিখে ফেলেন তিনি। একই সাথে শেখেন বাঁশের বাঁশী আর দোতারা বাজানো।

গানের সূত্র ধরেই তাঁর পরিচয় ঘটে একজন বাঙালি হিন্দু তরুণীর সাথে। মেয়েটার নাম ছায়া। একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে ছায়ার বাবা মারা গিয়েছিলো। ছায়া আশ্রয় নিয়েছিলো মিশনারিদের কাছে। সেখান থেকে স্কুলের পড়া শেষ করে একটা প্রাইমারি স্কুলে চাকরি করতো ছায়া। সেই সাথে প্রাইভেটে পড়াতো। গানের বাতিক ছিলো ছায়ার। বিনা ফিতে নানা ফাংশনে গাইতো। ছায়াই যত্ন করে ডেভিডকে বাংলা গান শেখালো। উর্দু গজলে তাঁর দক্ষতা ছিলো বলে নজরুলের গান শুনলেই তুলতে পারতো ডেভিড। ছায়া তাঁকে রবীন্দ্রনাথের গানও শিখিয়েছিলো। 'ঝংকার' নামে একটা গানের দল করেছিলো ছায়া। বিভিন্ন ফাংশনে গান গাইতো তারা। সেখানে তাদের সাথে কোরাসে গলা মেলাতেন ডেভিড।

ডেভিভ যে মেয়েটিকে প্রায় বয়ে নিয়ে এসেছিলেন তাঁর নাম নাজমা। নাজমাও গান গাইতো। তবে, ফাংশনে নয়, রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে। গান গেয়ে রাস্তায় ভিক্ষা করতো সে। এই মেয়েটার হতদরিদ্র পরিবারকে তাঁর বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন ডেভিড। নাজমা অবস্য বেশিদিন থাকেনি। বিয়ে হয়ে যায় তার। বাবা-মায়ের কাছ থেকে চলে যায় নাজমা। পাকিস্তান আর্মির অবরুদ্ধতার পর যুদ্ধের মাঝে ঘটনাচক্রে ডেভিডের সাথে আবার দেখা হয় নাজমার। নাজমা তখন সব হারিয়ে নিঃস্ব এবং রিক্ত। বেঁচে থাকার তাগিদে সে আঁকড়ে ধরে ডেভিডকে।

এতক্ষণ যে গল্প বললাম, সেটা একটা উপন্যাসের গল্প। উপন্যাসটার নাম হচ্ছে 'একটি কালো মেয়ের কথা'। এই উপন্যাসটা লিখেছেন বিখ্যাত ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। উপন্যাসের পটভূমিকা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অসংখ্য উপন্যাস লেখা হয়েছে, লেখা হয়েছে অনেক নাটক এবং অজস্র ছোটগল্প। সেই অসংখ্য সাহিত্যকর্মের মাঝে তারাশঙ্করের এই উপন্যাসটার আলাদা মাত্রা রয়েছে। এটিই প্রথম মুদ্রিত উপন্যাস যেখানে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এসেছে পটভূমিকা হিসাবে। উপন্যাসটা প্রকাশিত হয়েছে একাত্তর সালেই, আমাদের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মারা গিয়েছেন ১৯৭১ সালে। সেই হিসাবে এটা তাঁর একেবারে শেষ জীবনের সৃষ্টি। উপন্যাসটি অবশ্য 'একটি কালো মেয়ের কথা' নামে প্রকাশিত হয়নি। প্রকাশিত হয়েছিলো '১৯৭১' নামে। ওই প্রচ্ছদের ভিতরে আরও একটি উপন্যাস ছিলো। সেটির নাম হচ্ছে, 'সুতপার তপস্যা'। 'সুতপার তপস্যা' উপন্যাসটির পটভূমি ছিলো পশ্চিম বাংলা। ১৯৭১ সালে দুই বাংলাতেই অস্থির এক বারুদ সময় যাচ্ছিলো। দুই বাংলাতেই রক্ত ঝরছিলো। ইতিহাসের সেই অস্থির সময়কে তারাশঙ্কর ধরে রাখতে চেয়েছিলেন দু'টো উপন্যাসের মাধ্যমে। যে কারণে প্রকাশের সময়ে তিনি নিজেই আগ্রহ দেখিয়েছিলেন এক প্রচ্ছদের মধ্যে দু'টো উপন্যাসকে প্রকাশ করার। দুই বাংলার ইতিহাসকে একই ফ্রেমে আটকে রাখার একটা প্রচেষ্টা ছিলো তাঁর মাঝে।

মুক্তিযুদ্ধের প্রথম উপন্যাস বলতে আমরা আনোয়ার পাশার লেখা 'রাইফেল রোটি আওরাত'-কেই জানি। আনোয়ার পাশা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। পঁচিশে মার্চ এবং তার পরবর্তী সময়টাকে তিনি দেখেছেন একেবারে কাছে থেকে। পঁচিশে মার্চের প্রথম আঘাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে করেছিলো পাকিস্তান আর্মি। আনোয়ার পাশা সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি লিখে ফেলেছিলেন এই উপন্যাসটি।

দেশ স্বাধীন হবার মাত্র দুইদিন আগে চৌদ্দই ডিসেম্বরে আরও অনেক বুদ্ধিজীবীদের সাথে আনোয়ার পাশাকেও চোখে কালো কাপড় বেঁধে ধরে নিয়ে যায় পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বনকারী মিলিশিয়া বাহিনী আল বদর। মিরপুরে তাঁকে হত্যা করা হয়। 'রাইফেল রোটি আওরাতে' আনোয়ার পাশা তাঁর নিজের দেখা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকেই শিল্পের রস-মিশ্রিত করে পরিবেশন করেছেন। ফলে, এটা শুধু প্রথম উপন্যাসই না, আমাদের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখা অন্যতম সেরা একটা উপন্যাসও।

'রাইফেল রোটি আওরাত' আর 'একটি কালো মেয়ের কথা' এই দুই উপন্যাসের মধ্যে কোন উপন্যাসটা আগে লেখা হয়েছে, সেটা

বলা কিছুটা কষ্টকর। তবে, প্রকাশের দিনক্ষণকে বিবেচনায় নিলে 'একটি কালো মেয়ের কথা' প্রথম প্রকাশের মর্যাদা পাবে। 'রাইফেল রোটি আওরাত' প্রকাশ হয়েছিলো ১৯৭২ সালে।

'রাইফেল রোটি আওরাত' উপন্যাসে আনোয়ার পাশা আমাদের অবরুদ্ধ বাংলাদেশের চিত্র দেখিয়েছিলেন সুদীপ্ত শাহীনের চোখ দিয়ে। তএকটি কালো মেয়ের কথা' উপন্যাসে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সেটা আমাদের শুনিয়েছেন ডেভিডের জবানবন্দিতে। এই দুই চিত্রায়নই অবিশ্বাস্য রকমের সঠিক।

আনোয়ার পাশা একাত্তরের ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে গেছেন। অনেক কিছুই প্রত্যক্ষ করেছেন তিনি খুব কাছে থেকে। কিন্তু, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ব বাংলার কোনো নির্যাতন কিংবা প্রতিরোধ যুদ্ধ দেখেননি। তিনি তখন হাসপাতালে রোগ শয্যায় শুয়ে আছেন। তারপরেও পঁচিশে মার্চের যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন, এর পরবর্তী পাকিস্তানি নির্যাতন এবং বাঙালির প্রতিরোধকে তুলে এনেছেন, সেটা এক কথায় অবিশ্বাস্য। তিনি কি সবকিছু কল্পনা করে লিখেছেন? নাকি নির্ভর করেছেন পত্রিকার পাতার রিপোর্টের উপর? অথবা প্রত্যক্ষদর্শীদের সাথে কথা বলেছেন তিনি? এই তথ্য আমাদের জানা নেই। তবে, যেভাবেই তিনি একাত্তরের পূর্ব বাংলার চিত্র পান না কেনো, সেটা তিনি পেয়েছিলেন সঠিকভাবে। আর যে কারণে পূর্ব বাংলাতে পা না দিয়েও সেখানকার ঘটনাপ্রবাহকে অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর উপন্যাসে।

এই উপন্যাসে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার আশাবাদও ব্যক্তি করেছেন ডেভিডের মাধ্যমে। নাজমাকে নিয়ে আসার সময় ডেভিডকে সাহায্য করা হাজী সাহেব বলেছিলেন, তডেভিড সাহেব, তুমি নাজমারে নিয়া যাও উপার বাংলায়। ইপার বাংলায় যখন বাংলাদেশের ঝাণ্ডা উড়বে তখন তারে নিয়া তুমি এস এখানে।ততাই ডেভিড যখন উপন্যাসের একেবারে শেষে গিয়ে বলেন, তওকে আমি আবার ওদেশে ফিরে নিয়ে যাব।ত, তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশের ঝাণ্ডা উড়ানো দেশের কথাই ভেবেছেন, পরাধীন বাংলার কথা নয়।

রক্তাক্ত স্বাধীনতার অনেক বছর পরে এসে বাংলাদেশ আবার ক্রান্তিকালের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশে স্বাধীনতা বিরোধীরা শক্তিশালী হয়ে ওঠেছে। তাদের হুংকারে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিরা এখন অনেকটাই কোণঠাসা। স্বাধীনতার পক্ষের শক্তিরা এখন কিছুটা দিশেহারা এবং বিভ্রান্ত।

এই গ্রহণকালে এই সমস্ত মহৎ সাহিত্যগুলো আমাদের শক্তি যোগায়। একাত্তর শুধু আমাদের নির্যাতিত হবার করুণ ইতিহাসই না, আমাদের প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধেরও দৃপ্ত সময়। একাত্তর আমাদের জাতীয় জীবনের সবচেয়ে গর্বের জায়গা। তারাশঙ্করের 'একটি কালো মেয়ের কথা' বাংলাদেশের পাঠকদের সেই গর্বের জায়গাতে ফিরিয়ে যাবার শক্তিটা ধারণ করে। এটাই মহত্তম উপন্যাসের মহিমা।

অর্থনীতি

দ্রুততম বৃদ্ধির অর্থনীতিতে পলকে চাকুরি ছাঁটাই ধমক দিয়ে

অমিত দাশগুপ্ত

আমার ঘুমোতে যাওয়ার ও ঘুম থেকে ওঠার অভ্যেস বেশ দেরি করে। মাসের প্রথম দিনে (পয়লা ডিসেম্বর) ঘুম ভাঙল এক নিকট আত্মীয়ের ফোনে। তিনি অতীব কষ্টের সঙ্গে জানালেন, সেদিন সকালেই তাঁর মেয়ের (আমার স্ত্রীর ভাইঝির) চাকরি চলে গেছে। মেয়ে রাস্তা থেকে ফোন করেছে কাঁদতে কাঁদতে। মা ও মেয়ের পরিবারে সেই একমাত্র উপার্জনকারী। আমি ফোন করে জানতে পারলাম, তাঁকে একটি ক্যাফেতে ডেকে চাপ দিয়ে তৎকাল পদত্যাগপত্র লিখিয়ে নেওয়া হয়েছে, নাহলে তাঁকে বরখাস্ত করার হুমকি দেওয়া হয়েছিল। কেবল তাঁকেই নয় তার মত আরো ৩ জন মেডিক্যাল রিপ্রজেন্টেটিভকে একই ভাবে চাকরি থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁরা চার জনই প্রতিষ্ঠিত একটি সংস্থায় কাজ করতেন। এও জানা গেল সারা ভারতে ওই সংস্থার প্রায় অর্ধশত কর্মীর ওই ভাবেই চাকুরি গিয়েছে।

গত মাসের শেষের দুই সপ্তাহের দুটি শেষ কাজের দিনে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা হয়েছে। ২১ নভেম্বরে নতুন শ্রম আইন কার্যকরী করাটা নাকি ভারতে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আনবে, যেমনটা আট বছরের কিছু বেশি আগে জিএসটি দ্বারা এসেছে । ২৮ নভেম্বর ঘোষণা করা হল দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (জিডিপি-র) দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের পরিসংখ্যাণ, জিডিপি বেড়েছে ৮.২ শতাংশ হারে; কেবল তাই নয় মুদ্রাস্ফীতির (ভোগ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির) হার কমে দাঁড়িয়েছে ০.২৫ শতাংশ। আরো জানা গেল গত অক্টোবরে খাদ্যদ্রব্যের দাম কমেছে (তার আগের বছরের অক্টোবরের তুলনায়) ৫ শতাংশ। শ্রম শক্তি অংশগ্রহণের হার জুন ২০২৫-এর ৫৪.২ শতাংশের তুলনায় অক্টোবর ২০২৫ এ বেড়ে হয়েছে ৫৫.৪ শতাংশ।

উপরের দুটি অনুচ্ছেদকে মিলিয়ে দেখুন। বাজারের অভিজ্ঞতাকে দিয়ে মূল্যবৃদ্ধির হারকে অনুভব করুন। ভারতের অর্থনৈতিক প্রগতির

পরিসংখ্যানকে বুঝে যাবেন। বুঝে যাবেন, কেন আন্তর্জাতিক অর্থ ভান্ডার (আইএমএফ) জাতীয় আয় সংক্রান্ত পরিসংখ্যানকে 'সি' গ্রেড দিয়েছে। ওই পরিসংখ্যান অনুযায়ী স্থির মূল্যে জিডিপি বৃদ্ধির হার জুলাই-সেপ্টেম্বর (দ্বিতীয়) ত্রৈমাসিকে ৮.২ শতাংশ, এবং মুদ্রাস্ফীতির হার ০.৫ শতাংশ। অতএব ভারত বৃহৎ অর্থনীতিগুলির মধ্যে দ্রুততম বৃদ্ধির দেশ। তাছাড়াও দেশে শ্রমশক্তির অংশগ্রহণের হারও বেড়েছে, একই সঙ্গে ধমক দিয়ে পলকে চাকুরি থেকে পদত্যাগে বাধ্যও করা হচ্ছে; সত্য মোদিজি, কী বিচিত্র এই দেশ!

এই প্রসঙ্গে শব্দগুলিকে একটু বুঝে নেওয়া যাক। জিডিপি বলতে তাকে বোঝায়, দেশের মধ্যে উৎপাদনকারীরা তাদের কাজের মাধ্যমে যে মূল্যযোগ করে তার সঙ্গে পরোক্ষ কর যুক্ত করে যা পাওয়া যায়। প্রত্যেক উৎপাদক যে দামে পণ্য বিক্রয় করে ও সেই উৎপাদন করতে যে উপকরণের উপর ব্যয় করে তার তফাৎকে মূল্যযোগ বলে। ওই মূল্যযোগ তদর্থে শ্রমের মজুরি, মূলধনের সুদ, জমির খাজনা, ও মোট মুনাফা (অবচয় বাদ না দিয়ে)-র যোগফল। অপরদিকে ওই মজরি-সুদ-খাজনা-মোট মুনাফা ব্যক্তি ও সংস্থা যে ব্যয় করে, ভোগের জন্য বা বিনিয়োগের জন্য তার যোগফল (অবশ্যই তার থেকে আমদানি বাদ দিয়ে ও তার সঙ্গে রফতানি যোগ করে)। তাই জিডিপি দুভাবে মাপা যেতে পারে, মূল্যযোগের মাধ্যমে ও ব্যয় পরিমাপের মাধ্যমে। দুটির পরিমাণ সমান হওয়া উচিত। তবে তাতে সামান্য তারতম্য হতে পারে।

কিন্তু জুলাই-সেপ্টেম্বর (দ্বিতীয়) ত্রৈমাসিকে সেই ফারাক মোট জিডিপির ৩.৩৩ শতাংশ। যদি ওই ফারাক ব্যতিরেকে জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৪ এর সঙ্গে জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এর মোট ব্যয়ের ভিত্তিতে জিডিপির বৃদ্ধির হারের পরিমাপ করা হয়, তাহলে ওই হার দাঁড়াবে ৪.১ শতাংশ। কারণ ওই ফারাক না ধরলে মোট ব্যয়ের ভিত্তিতে জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৪ এর স্থির মূল্যে জিডিপি হবে ৪৫.১৫ লক্ষ কোটি টাকা জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০২৫ এ ৪৭.০১ লক্ষ কোটি টাকা। তাই জিডিপি পরিমাপের ক্ষেত্রে একটা গলদ রয়েছে বলাই যেতে পারে। মনে রাখা দরকার, সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫ ত্রৈমাসিকে স্থির মূল্যে জিডিপির পরিমাণ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪ ত্রৈমাসিকে স্থির মূল্যে জিডিপির পরিমাণের থেকে ৮.২ শতাংশ বেশি।

দ্বিতীয়ত, ধরা হয় যে দেশের জিডিপির ৫৫ শতাংশ আসে সংগঠিত ক্ষেত্রের থেকে ও ২৮ শতাংশ অসংগঠিত ক্ষেত্র থেকে। বাকি ১৭ শতাংশ কৃষি ক্ষেত্র থেকে। যেহেতু অসংগঠিত ক্ষেত্রের পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না তাই সংগঠিত ক্ষেত্রের ত্রৈমাসিক পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে অসংগঠিত ক্ষেত্রের পরিমাপ করা হয়। অর্থাৎ যদি সংগঠিত ক্ষেত্রের মূল্যযোগ হয় ১০০, তাহলে অসংগঠিত ক্ষেত্রের মূল্যযোগ ধরা হবে (১০০/৫৫) ড ২৮ গু ৫১। অতএব কৃষি ব্যতিরেকে মোট মূল্যযোগ হবে ১৫১। এই যে ২৮ শতাংশ অসংগঠিত ও ৫৫ শতাংশ সংগঠিত ক্ষেত্র এই বিভাজন ২০১১-১২ সালের। এর মধ্যে ২০১৬র নোট বাতিল, ২০১৭-র জিএসটি ও ২০২০-২১ এর কোভিড অসংগঠিত ক্ষেত্রের উপরে জোর আঘাত হেনেছে। ফলে অসংগঠিত ক্ষেত্র কমেছে ও সংগঠিত ক্ষেত্রের অনুপাত বেড়েছে। যেমন মুদির দোকানের বিক্রির অনুপাত মোট অনুরূপ পণ্যের বিক্রির তুলনায় কমেছে, সুইগি-জোম্যাটো-জেপ্টোর বিক্রি বেড়েছে। ফলে এখন আর তা ৫৫ঞ্জ২৮ নেই। ধরা যাক, তা ৬০ঞ্জ২৩ হয়েছে (বাকি ১৭ শতাংশ কৃষিতে রয়েছে)। সেক্ষেত্রে, আমাদের উদাহরণের সংগঠিত ক্ষেত্রের মূল্যযোগ ১০০ হলে তাহলে অসংগঠিত ক্ষেত্রের মূল্যযোগ হবে (১০০/৬০) ড ২৩ গু ৩৮। অতএব কৃষি ব্যতিরেকে মোট মূল্যযোগ হবে ১৩৮। ফলে কৃষি ব্যতিরেকে অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে উৎপাদিত জিডিপি-র পরিমাণ ১৫১ থেকে কমে ১৩৮ হবে। ফলে সামগ্রিক জিডিপি-র পরিমাণ বহুল পরিমাণে কমবে। এই গলদও জিডিপি পরিমাপে রয়ে গিয়েছে। সংগঠিত ক্ষেত্রের বিস্তৃতি অসংগঠিত ক্ষেত্রকে ক্রমাগত কোনঠাসা করছে। সেটিকে আরো বেশি মাত্রায় করার জন্য শ্রম আইনকে বৃহৎ শিল্পের জন্য লঘু করা হচ্ছে।

জিডিপির পরিমাপের অন্যান্য অসামঞ্জস্য, বিশ্বে ভারতের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতির গর্বিত উচ্চারণের সময়ে মাথাপিছু আয়ের পরিমাপে বিশ্বে ১৩৬ তম অবস্থান বিষয়ে নীরব থাকা; এসব নিয়ে আলোচনা করা তাই সময়ের দাবি।

পশ্চিমবঙ্গে চাকরি ও কর্মসংস্থানের হাল

শুভ্রাংশু কুমার রায়

ভূমিকা

স্বর্গ নরকে কোনো চাকরি নেই কারণ ব্যক্তিগত সম্পত্তি নেই। চিত্রগুপ্তকে যম মাসমাইনে দিতেন কিনা জানা নেই। মাঝে পৃথিবীতে ব্যক্তিগত সম্পদ সৃষ্টি থেকে শ্রমের বিভাজন একদা এমন হল যে সম্পদশালীর হয়ে শ্রম করলে তবে সেই সম্পদহীন শ্রমিক তার জীবনধারণের জন্য অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের উপকরণ পেতেন। সেই

চাকরি প্রথার শুরু। তখন চাকর অনেকটাই দাস। ইতিমধ্যে ভক্ত ভগবানের দাস, প্রেমিক প্রেমিকার দাস হয়েছেন। সে অন্য কথা। কিন্তু অব্রাহ্মণ রাজা থেকে প্রজা সবাই শিক্ষিত ব্রাহ্মণ পুরোহিতের দাস থেকে ভারতে গণ্ডগোলের শুরু। সেই সংক্রমণে ভুক্তভোগী কেন্দ্র ভারত, অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবাংলা। বর্তমানে অশিক্ষিত রাজনৈতিক শাসক দলের মন্ত্রীনেতাদের দাস হয়ে যাচ্ছেন সরকারি আমলারা। এরা ১৪০ কোটি ভারতবাসীর সামান্য কয়েকজন সরকারি চাকুরীজীবী। বিরোধীরা এদের দলদাস বলে। শ্রমের মর্যাদা চুলোয় যাচ্ছে। একদা শিক্ষিত সবথেকে এগিয়ে পশ্চিমবাংলা এখন সবথেকে বেশি ভুক্তভোগী। আর এই ফাঁকে ঘুণপোকার মতো বাসা বাঁধল চাকরির প্রতিশব্দ 'কর্মসংস্থান' যার কোনো নির্দিষ্ট চরিত্র নেই।

চাকরি

মণ্ডল কমিশন কার্যকর হওয়ার আগে পশ্চিমবাংলায় সামাজিক ভাবে সবথেকে পিছিয়ে পড়া হিন্দু সমাজে চর্মকার, কুম্ভকার, ডোম, চর্মকার, মেথর ইত্যাদি পেশা মোটামুটি সংরক্ষিত ছিল। বাকি অনগ্রসরের জন্য সংরক্ষণ তেমন সমস্যা হয়ে ওঠেনি। কিন্তু এও ঘটনা, বাংলায় অজস্র সমাজ সংস্কারক মনীষী জন্ম নিলেও, অনেক মতাদর্শ আলোড়িত করলেও শিক্ষার আলো সর্বত্র সমান ভাবে পৌঁছয়নি। কিছু ঘটনা অপ্রত্যাশিত ছিল। এক, সাচার কমিটির রিপোর্টে (২০০৬) পিছিয়ে পড়া মুসলিম সমাজে সংরক্ষণের অধিকারের দাবি। দুই, মতুয়া সমাজের দাবি। তিন, উত্তরবঙ্গ বিভাজনের দাবি। চার, ২০১১ সালে শাসক সরকারে পরিবর্তন। অন্ধকার আগে ছিল, এবার প্রকাশ্যে এল। রাজনীতির জট আরও পাকাল।

পশ্চিমবঙ্গের কৃষি, শিল্প ও পরিষেবার নতুন সাহসী ব্যতিক্রমী ভাবনা শুরুর আগেই ধ্বংস হয়ে গেল। ইতিমধ্যে ১৯৯০-উদার নয়া অর্থনীতির চাপে সরকারি ক্ষেত্র তথা চাকুরি সঙ্কুচিত হতে শুরু করেছে। চাকুরির আঙ্গিক ও চরিত্র বদলাতে শুরু করেছে অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গেও। অথচ পড়ে পাওয়া চোদ্দআনা নতুন সরকার টিকিয়ে রাখতে হবে। এর আগের সরকারে জন্ম নেওয়া ঠিকাদারের উত্তরসূরীরা রঙ পালটে নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করে নিল। ক্ষমতাবানেরা পেল সিন্ডিকেট, তোলা, সম্পদ লুঠের অধিকার। অপেক্ষাকৃত নিরীহদের চাকরির জায়গায় বিকল্প পুনর্বাসন দেওয়া শুরু হল 'কর্মসংস্থান'-এর মাধ্যমে। কেন্দ্র রাজ্য এখন চাকরি দেওয়ার নাম করে না। সরকারি বাজেটে অস্থির অনির্দিষ্ট কর্মসংস্থান পাকাপাকি জায়গা করে নিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ

সরকারি কাজের জায়গায় সংরক্ষণ প্রক্রিয়া জোরদার করার পর সরকারি চাকুরি আরও সীমিত দুর্লভ হয়ে যাচ্ছে। সংরক্ষণ প্রক্রিয়াকে অপরিহার্য ভেবে ব্যাপক সংস্কারে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে যাচ্ছে। নির্মম অভিজ্ঞতা, পশ্চিমবঙ্গে কর্মদক্ষতা ও কর্মসংস্কৃতি অবহেলিত। দক্ষ কর্মী, মেধাবী শিক্ষিত মানুষ পশ্চিমবাংলা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন কেউ পরিযায়ী হয়ে, কেউ পাকাপাকি অন্যত্র বসবাস শুরু করে। নিরুপায় অন্য মানুষ বিভিন্ন অদক্ষ অপ্রচলিত অসংগঠিত পথে দিন গুজরান করছেন যেখানে কাজের সুরক্ষা খুব কম। এখানে চুঁইয়ে পড়া অর্থনৈতিক অনুদান দিয়ে আরও অকর্মণ্য করে তোলা হচ্ছে কর্মক্ষমতাকে।

পরিসংখ্যান

ভারতে GSDP (Gross State Domestic Product) অনুযায়ী চতুর্থ স্থানে পশ্চিমবঙ্গ (১৭.২ লক্ষ কোটি)। মাথাপিছু আয় পঞ্চমস্থানে বছরে ১,৫৫,০০০ টাকা (প্রায়)। খুব খারাপ বলা যাচ্ছে না। ২০২৩-২৪ বাজেট ও সরকারি রিপোর্ট অনুযায়ী GDP-তে রাজ্যের মোট উৎপাদন পণ্য-পরিষেবার আর্থিক মান ক্ষেত্র অনুযায়ী অনুপাত (শতকরা অঙ্কে) সঙ্গে বন্ধনী মধ্যে ভারতের সংখ্যাতত্ত্ব দেওয়া হলঃকৃষিঃ১২-১৪ (১৫-১৮), শিল্প ২০-২২ (২৫-২৭) ও পরিষেবা ৩৩-৬৬ (৫৩-৫৫)। আর কর্মসংস্থান ক্ষেত্রে শ্রম-জরিপ অনুযায়ী অনুপাতঃ কৃষি ৩৫-৪০ (৪২.৪৫), শিল্প ২০-২৫ (২৫-২৭) ও পরিষেবা ৩৫-৪০ (৩০-৩২)। ভারতে সামগ্রিক বেকারত্বের হার ৫.৬। পশ্চিমবঙ্গ তুলনায় ভাল ২.২। সকার ও বেকার সংখ্যাতত্ত্ব নির্ধারণে আর একটি নতুন উদ্যোগ চালু হয়েছে; পিরিওডিক লেবার ফোর্স সার্ভে। এটি জাতীয় পরিসংখ্যান অফিস পরিচালিত ভারতের কর্মসংস্থান ও বেকারত্ব সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের আধুনিক পদ্ধতি। জাতীয় পরিসংখ্যান অফিস (NSO) পরিচালনা করে। সোজা কথায় ১৫ বছর বা তার বেশি বয়সের জনসংখ্যার মধ্যে কত শতাংশ ব্যক্তি কাজ করছেন অথবা সক্রিয়ভাবে কাজ খুঁজছেন (Labour Force Paarticipation Rate), শ্রমিকের জনসংখ্যার অনুপাত, বেকারত্বের হার ইত্যাদি দিয়ে নতুন ভাবে অঙ্ক কষা হয়। এখান থেকে শ্রমবাজারের একটা ছবি পাওয়া যায়। অর্থাৎ কর্মসংস্থান ও বেকারত্বের আর এক পদ্ধতির বাস্তব ও সময়োপযোগী পরিসংখ্যান। চাকরি দিতে না পেরে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার নানা প্রকল্পে কর্মসংস্থান ক্রমশ বাড়াচ্ছে। LFPR ভারতে ৫৭.৯, পশ্চিমবঙ্গে ৫১.১।

বিশ্বব্যাঙ্কে 'পভার্টি অ্যান্ড ইকুইটি ব্রিফস' অণু রিপোর্টে (এপ্রিল'২৫) ভারতে চরম দারিদ্র অনেকটাই কমেছে। অকৃষিক্ষেত্রে মাত্র ২৩ কাজ সংগঠিত ক্ষেত্রের আওতায়। ভারতে ভোগভিত্তিক গিনি সূচক (আয় বা সম্পদের বণ্টনের সমতা/অসমতা সূচক) ০.৫২ (২০০৮) থেকে ০.২৮ (২০১২-১৩,। অর্থাৎ ভোগ বৈষম্য মাঝারি মানের। নেপথ্যে গোপন রইল এর কারণ ভারতের দারিদ্র উন্নয়ন মূলক প্রকল্পে গরিব মানুষের হাতে নগদ টাকা, সস্তায়/বিনামূল্যে চাল বিতরণ ইত্যাদি যার ফলে প্রকৃত কর্মক্ষম ব্যক্তির কর্মবিমুখতা, কর্মশক্তির অবক্ষয় বাড়ছে, আত্মনির্ভর মর্যাদাপূর্ণ ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস হচ্ছে, প্রকৃত মানবসম্পদের বিকাশ বাধা পাচ্ছে। তাও আবার সুষম বণ্টনের অভাবে অপচয় হচ্ছে।

ওয়ার্ল্ড ইনকাম ইকুয়ালিটি ডেটাবেসে তাই ভারতে দারিদ্রের পরিসংখ্যান বেদনাদায়ক, গিনি সূচক ০.৫২ (২০০৪) থেকে বেড়ে হয়েছে ০.৬২ (২০২৩)। সমালোচনা উঠেছে পরাধীন ব্রিটিশ রাজের থেকে স্বাধীন বিলিওনিয়ার রাজে দুরবস্থা বেশি। লন্ডনের সোয়াস বিশ্ববিদ্যালয়ে অসাম্যের নিরিখে বিশ্বে ২১৬টি দেশের মধ্যে ভারত ১৭৬ও তম (২০০৯ -১১৫ তম) স্থানে। পশ্চিমবঙ্গ অজুহাত দিতেই পারে, বাকি ভারত আরও খারাপ। কূটতর্কের অসীম ক্ষমতা।

এই সংখ্যাতত্ত্বে অধিকাংশ জায়গায় ভারতের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মিল আছে। বিশ্বে ভারত অনুন্নত বা উন্নয়নশীল হলে পশ্চিমবাংলাও তাই। কিছু জায়গায় পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা গড় ভারতের থেকে ভাল। কিন্তু পরিসংখ্যান সব কথা বলে না। বাস্তবের সঙ্গে মিলছে না। অর্থাৎ হয় পরিসংখ্যানের অঙ্কের তথ্যসূত্র ভুল অথবা গোটা পদ্ধতিতে কারসাজি আছে।

পরিসংখ্যানের বাইতে বাস্তবে ছবি

চতুর্বর্ণ প্রথায় শূদ্র ও দাস ব্যবস্থা ছিল। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে শাসক রাজনৈতিক দলের আশ্রয়ে তাদের অনুপ্রেরণায় টিকে থাকার স্বভাব-চরিত্র দেখে পাগলা দাশুর মতো বলতে ইচ্ছা করে -আবার সে আসিল ফিরিয়া। বিনাশ্রমে বিনাব্যয়ে বুঝে-বা না-বুঝে (সরকারি রাজকোষ থেকে) সামান্য কিছু পেলেই ভোটযন্ত্রে বিনাশ্রমে শাসকের পক্ষে ভোট পড়ে যায়। পরপর নিরঙ্কুশ আধিপত্যে গণতান্ত্রিক স্বীকৃতি পায় চাকরি থেকে কর্মসংস্থানের এই রূপান্তর যা আগামী দিনে অবৈধভাবে সুযোগপ্রাপ্ত মানুষকে কর্মনাশার অন্ধকূপে ফেলছে। নব কলেবরে শূদ্র-দাস প্রথার এ কালের কর্মসংস্থাপনায় সম্ভবামি অন্ধকার যুগে যুগে।

১৯৪৭-স্বাধীনতা ও ১৯৫০; সংবিধান ভারতে অর্থবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে অনুশীলন, নীতি ও প্রয়োগের গঠন এবং চরিত্র বদলে দিয়েছে। সবথেকে বেশি প্রভাবিত হয়েছে শ্রমব্যবস্থা। স্বাধীন জনগণের কাছে স্বাধীন ভারত রাষ্ট্র ও সরকার, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও সরকার নতুন বিষয় যাদের কাউকে চোখে দেখা যায় না। বিমূর্ত এই ব্যবস্থাকে কাজের মাধ্যমে বোঝা যায়। কাজের অস্তিত্ব শ্রমে। আর সেখানেই যত অস্পষ্টতা, অস্বচ্ছতা। আপনি আচরি ধর্মে দেখা যাচ্ছে, বাড়ির কাজে ব্যক্তি-মালিক দিনমজুর শ্রমিকের প্রতি নিখুঁত শ্রম, সর্বাধিক উপযোগিতা ও সবথেকে কম মজুরিদান প্রত্যাশা করে।

আবার তিনি যখন সরকারি কাজে নিজে শ্রমিক হয়ে কাজ করেন তখন সে অর্থ নীতি শাস্ত্র উলটে যায়। জ্ঞানত বা অজ্ঞানত শ্রম, প্রয়োজনীয় শ্রম, উদ্বৃত্ত শ্রম ইত্যাদির গঠন চরিত্র ইত্যাদির রূপান্তর হয়। সমাজে এই অংশ থেকে সুস্থ সুষম সর্বজনীন শ্রমব্যবস্থার নেতৃত্ব দিলে গোড়ায় গলদ থেকে যায়। এর সঙ্গে যোগ করতে হবে বর্তমান শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় সরকারের দায়িত্ব। এই জায়গাও উলটে যাচ্ছে। ক্রমশ সরকারি আইন-শাসন-বিচার ব্যবস্থায় দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারি মন্ত্রী, আমলা ও তাদের প্রশ্রয়ে সদস্য সমর্থক সমাজের দায় হয়ে উঠেছে। এরাই ইচ্ছেমতো চাকরি তৈরি করছেন, নষ্ট করছেন। ফের শূন্যস্থান পূরণ করছেন কর্মসংস্থানের গোঁজামিল দিয়ে। কাজের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত অরাজকতা চলছে।

ধরা যাক এই রাজ্যে অধিকাংশের হাতে কাজ আছে। অনেকে শ্রমনির্ভর উৎপাদন কাজে ও ব্যবসায় ব্যস্ত। কৃষি শিল্প পরিষেবা ইত্যাদি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অগ্রগতি ঘটছে। তাহলে ধর্ষণ, লুট, অবৈধ নানা কাজ কারা করছে? ধর্ম, সম্প্রদায়ের নামে নিজেদের মধ্যে হিংসা, হিংস্রতার রাজনীতি কখন করবেন? যে কোনো দেশের প্রাথমিক পরিচয় শিক্ষা ও স্বাস্থ্য। পশ্চিমবঙ্গে সরকারি শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা হচ্ছে। বিরোধীদের অভিযোগ, পরিকল্পিত ভাবে হচ্ছে এই ধ্বংসযজ্ঞ। দুর্বল অশিক্ষিত আগামী প্রজন্ম যাতে কিছুতেই মাথা তুলে না দাঁড়াতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের স্বঘোষিত দাবি, ভারতে সবথেকে এগিয়ে রাজ্য। কর্মসংস্থানের জটিল জালিয়াতিতেও এগিয়ে আছে এই রাজ্য। জ্বলন্ত প্রমাণ সরকারের আত্মপক্ষ সামলাতে সর্বক্ষণ নিম্ন থেকে উচ্চ আদালতে জনগণের করের অর্থ অপচয়ে ছোটাছুটি। সরকারি সাধারণ কর্মীরা মাইনের ব্যাপারে বীতশ্রদ্ধ।

ইয়োর্স ফেথফুলি

ইংরেজ শাসনকালে সরকারিভাবে 'সরকারি চাকরি' শব্দের ব্যবহার জনপ্রিয় হয়। সেকালে সরকারি চাকরির আলাদা কদর ছিল। ব্রিটিশ আনুগত্যের মধ্যে একটা ইংরেজ মালিকানার ছোঁয়া আত্মতৃপ্তি দিত। আশ্চর্য ব্যাপার (ত্রস্তুত্বত্র বাংলায় সেবা বা পরিষেবা, শুনতে ভাল। কিন্তু servant মানে চাকর। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে ভগবানের ভৃত্য দাস হওয়া যায়। কিন্তু ব্যক্তি মানুষের চাকর মোটেই ভাল লাগে না। বাংলার জমিদাররা ইংরেজদের চাকর ছিলেন না যদিও রায়বাহাদুর ইত্যাদি খেতাবের জন্য কিছুক্ষেত্রে বাঙালি জমিদার দাসেরও অধম ছিল।

'চাকরি' শব্দ এভাবে মর্যাদাসম্পন্ন বৃত্তি হয়ে গেছে সমাজে ১৯০০ শতাব্দ থেকে। গড়পড়তা মধ্যবিত্ত বাঙালি, বিশেষ করে হিন্দু বাঙালির উত্থানের কারণ আকর্ষণীয় পেশা এই চাকরি। লিখিত পেশাগত ভদ্রলোকের চুক্তি পারিশ্রমিক, সময়, দক্ষতা, অধিকার ও সুযোগ দিয়েছে। সংগঠন করার সুযোগ বা অধিকার অর্জিত হয়েছে পরাধীন ভারতে। কালক্রমে উৎপাদন ভেদে শ্রমের চরিত্র বদলালে চাকরির রকমফের হল। সরকারি চাকরি, বেসরকারি চাকরি, পার্ট-টাইম/ফুলটাইম চাকরি, চুক্তিভিত্তিক চাকরি ইত্যাদি। ১৯০০ শতাব্দের শেষে দেখা গেল বাজার অর্থনীতির দাপটে 'চাকরি' বিবর্তিত হয়েছে 'কর্মসংস্থানে'। চাকরি ক্ষেত্রে অর্জিত অধিকার কর্মসংস্থানে হারিয়ে গেল। সরকারি কর্মী সংস্খ্যা কমার সঙ্গে কর্মীদের সংগঠনশক্তি দুর্বল হয়ে যাচ্ছে।

কর্মসংস্থান

স্বাধীনতার হস্তান্তর হয়েছে। ব্রিটিশ শাসকের চেয়ারে সামনে বসেছে শাসক রাজনৈতিক দল। পিছনের আসনে কর্পোরেট সেক্টর। চাকরির আর সেদিন নাই, সুদিনও নেই। শ্রমিকের পক্ষে একদা পারিশ্রমিক, সময়, দক্ষতা, অধিকার, সুযোগ ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। সংগঠন করার সুযোগ বা অধিকার বাজার অর্থনীতির মুনাফাসর্বস্বতা কেড়ে নিচ্ছে। বাজারের পরিবর্তনের সঙ্গে শ্রমের যোগান ও চাহিদার পরিবর্তন হয়ে চলেছে। পশ্চিমবাংলায় কাজের চাহিদা অনেক। কিন্তু দুর্বল অর্থনীতির জন্য কায়িক শ্রমের চাহিদা, অদক্ষ শ্রমিকের চাহিদা বাড়ছে। এমন শ্রমের জোগানও বেশি। কারণ কর্মক্ষেত্রে শিক্ষা দক্ষতার অভাবে এমন অপরিণত শ্রমিক ছেয়ে গেছে কাজের বাজারে। আদর্শহীন নীতিহীন বাজারের সব লক্ষণ স্পষ্ট এই রাজ্যে।

পশ্চিমবঙ্গের কৃষি-শিল্প-পরিষেবা সব এখন স্বপ্ন

সাধারণভাবে ন্যূনতম বেতন, কাজের ক্ষেত্রে সুরক্ষা, কাজের সুস্থ পরিবেশ, অবসরকালীন ভাতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে নিয়মনীতির প্রতি সরকারি নজরদারির অভাব প্রবল। সবমিলিয়ে এই বড় কৃষিক্ষেত্র চূড়ান্তভাবে অসংগঠিত এবং অদক্ষ। এখানে কর্মসংস্থানের কৌশলী প্রয়োগ করা হচ্ছে। এক অংশ বিশেষ করে বয়স্করা ভিটেজমি ছেড়ে যেতে চাইছেন না। আর এক অংশ অল্পবয়সী কর্মঠ যুবক পশ্চিমবঙ্গ ত্যাগ করে দক্ষিণ পশ্চিম ভারত এমনকি পশ্চিম এশিয়ায় চলে যাচ্ছেন জীবন বাজি রেখে। এও একধরণের অসরকারি কর্মসংস্থান প্রকল্প। অথচ কৃষিক্ষেত্রে বিশেষ করে আলু ধান আনাজ, বাগিচা ক্ষেত্রে চা, আম আনারস, বরজে পান ইত্যাদির ফলন প্রচুর। মৎস্য ক্ষেত্রেও প্রচুর সম্ভাবনা। অথচ সুন্দরবন অঞ্চলে মৎসজীবী শ্রমজীবী মানুষ বিপন্ন। এসব ক্ষেত্রে উৎপাদকরা অসংগঠিত চাকরির ব্যবস্থা করতে পারছেন না।শ্রমজীবী মানুষ শাসক রাজনৈতিক দয়াদাক্ষিণ্যের ওপর সামান্য অর্থের সাময়িকী কর্মসংস্থানে কোনোরকমে টিঁকে আছে।

একজন ব্যক্তি তার জমি চাষ করছেন ট্রাকটর পাওয়ার-টিলার, কম্বাইন্ড হার্ভেসটরের মাধ্যমে। তিনি আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্সের সাহায্যে ড্রোনের মাধ্যমে কীটনাশক ছড়াচ্ছেন, ফসলের নজরদারি করছেন। তিনিই আবার তাঁর খামারে ধান, চাল, ভূট্টা নিজে ট্রাকে করে নিয়ে যাচ্ছেন প্রক্রিয়াকরণের জন্য, প্যাকেজিং-এর জন্য। এই ব্যক্তিকে চাষী, ক্ষুদ্র শিল্পপতি বা পরিষেবাক্ষেত্রে কর্মী কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে ফেলা যাচ্ছে না। এরা কিছুটা অবস্থাপন্ন ও স্বনির্ভর। এঁরা সরকারের কর্মসংস্থানের ওপর নির্ভর করেন না। আজকের উন্নত কৃষিব্যবস্থার এরাই মানবসম্পদ। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এমন স্বনির্ভর উৎপাদকের সংখ্যা খুব কম। হয়তো অধিকাংশ ভূমিসংস্কারের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়াজাত ছোট ছোট জোতের জন্য। এজন্য পশ্চিমবঙ্গে কর্মসংস্থানের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

কৃষিতে জৈবপ্রযুক্তির প্রয়োগ সীমিত, শিল্প-প্রযুক্তি ব্যবহারে পিছিয়ে। গ্রামে ছদ্মগুবেকার অনেক। উত্তরবঙ্গে মালদহ, মুর্শিদাবাদ, দুই দিনাজপুর, কোচবিহার থেকে সবথেকে বেশি মানুষ পশ্চিমবঙ্গে কৃষিক্ষেত্রে উপযুক্ত মজুরি না পেয়ে বা অন্য রাজ্যে নির্মাণ শ্রমিক, ধাতুশিল্প শ্রমিকের কাজে বেশি মজুরি পেয়ে পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে দিন কাটাচ্ছেন। সেই বাঙালির একাংশকে সাম্প্রতিক জনশুমারিতে বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়ার উপক্রম হচ্ছে।

কৃষি-সহায়ক ক্ষুদ্র শিল্পের প্রচুর সম্ভাবনা কাজে লাগানো হচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গের ভারি এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প রাজ্যে ভরসা পাচ্ছে না।

এ ব্যাপারে সরকারি সভা, মেলা হচ্ছে। শিল্পপতিরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন বাধ্য হয়ে। কিন্তু এগিয়ে আসছেন না। অধিকাংশ অকার্যকর থেকে যাচ্ছে। দীর্ঘসূত্রী হচ্ছে বা ফলপ্রসূ হচ্ছে না। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের শিল্প-বাণিজ্য নীতি ব্যর্থ। খাস জমি পেয়েও ভারি শিল্প হচ্ছে না। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প পিছিয়ে যাচ্ছে। একদা এই রাজ্যের অর্থকরী ফসল চা ও পাট শিল্পে উন্নত ছিল। শিল্পক্ষেত্রে বড় অংশে চাকরির অনেক সম্ভাবনা ছিল। সে জায়গা নষ্ট হতে শুরু করেছে ২০১০-পূর্ব সরকারের শেষ পর্বের অমনোযোগিতা ও অবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য।

পরিষেবা শিল্পে কর্মীদের দূরবস্থা সামান্য কম। পারিশ্রমিক প্যাকেজ নির্ভর। দিনে আট ঘন্টার শ্রমের সীমা উধাও। সর্বদা ছাঁটাইয়ের আতঙ্ক। টার্গেট মেটাতে গিয়ে অসুস্থ প্রতিযোগিতায় সহকর্মী শত্রু হয়ে যাচ্ছে। স্বাস্থ্যকর্মীদের স্বাথ্য ভাল নেই। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নারী স্বাস্থ্যকর্মী সবথেকে ক্ষতিগ্রস্ত। পরিষেবা ক্ষেত্র অধিকাংশ অনলাইন নির্ভর। অনলাইনে ২৪ ঘন্টা নিরাপদ নয়।

উপায়

কর্মসংস্থানকে ফের চাকরি, স্বাবলম্বনযুক্ত কাজ, সুস্থ বাজারে ব্যবসা ইত্যাদিতে রূপান্তর করতে হবে। আপাতত ভরসা ভারতের আইন, শাসন ও বিচার ব্যবস্থার কার্যকরিতা। আপাতত উপায় ভারতের সংবিধানে ভারতীয় নাগরিকের নিম্নলিখিত অধিকার।

১. শিক্ষার অধিকার যা মৌলিক অধিকার (অনুচ্ছেদ ২১এ) যা ৮৬তম সংবিধান সংশোধনের (২০০২ সালে) মাধ্যমে সংযোজিত হয়। এই সংশোধনের ভিত্তিতে ২০০৯ সালে 'বিনামূল্যে ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা অধিকারের আইন' (RTE Act éôé Right to Education Act) চালু (১-৪-২০১০) হয়। এই আইনের প্রধান দাবিঃ রাষ্ট্র ছয় থেকে চোদ্দ বছর বয়সের প্রতিটি শিশুকে বিনামূল্যে ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার প্রদান করবে যা রাষ্ট্র আইন দ্বারা নির্ধারণ করবে। প্রতিটি সরকারি স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সুব্যবস্থা চাই।

২. কাজের অধিকার (অনুচ্ছেদ ৪১) যা সরাসরি মৌলিক অধিকার নয়। কিন্তু পরিচালনামূলক নীতিসমূহ (Directive Principles of State Policy)-এর অধীনে স্বীকৃত এবং পরোক্ষভাবে কিছু আইনি ব্যবস্থার মাধ্যমে নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই আইনের প্রধান দাবিঃ রাজ্য তার অর্থনৈতিক সক্ষমতা ও উন্নয়নের সীমার মধ্যে থেকে নাগরিকদের কাজ, শিক্ষা ও জনসহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করবে। রাষ্ট্র নাগরিকদের কাজের সুযোগ দেবে। বেকার, বৃদ্ধ ও অক্ষম নাগরিকদের সহায়তা করবে। বর্তমানে গণতান্ত্রিক দাবি , সর্বত্র সুস্থ, স্বাস্থ্যকর, সুরক্ষিত, স্থায়ী ও সম্মানজনক কাজের পরিবেশ চাই।

৩. বাঁচার অধিকার যা মৌলিক অধিকার (অনুচ্ছেদ ২১)। প্রতিষ্ঠিত আইন আনুসারে কোনো ব্যক্তিকে তার জীবন বা ব্যক্তিস্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

৪. নাগরিকদের উপযুক্ত জীবিকার অধিকার (অনুচ্ছেদ ৩৯-এ), জীবিকার ক্ষেত্রে ন্যায়সংগত মজুরি ও শ্রমিকদের মর্যাদা নিশ্চিতকরণ (অনুচ্ছেদ ৪৩), জবরদস্তি শ্রম ও শিশুশ্রম নিষিদ্ধ (অনুচ্ছেদ ২৩ ও ২৪)

শেষ উপায়: গণতান্ত্রিক পথে নিজেকে শিক্ষিত করবেন শ্রমিক। এই অব্যবস্থায় বিস্তর অপ্রাপ্তির মধ্যেও উদাহরণ আছে আইনের মাধ্যমে অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকের প্রাপ্য বকেয়া আর্থিক পাওনা কোটি কোটি টাকা উদ্ধার করার।

দেশের খবর

রোহিঙ্গা অন্তর্ধান- অমানবিক অবস্থান নিতে উদগ্রীব সুপ্রিম

মনিরুল হক

আমাদের দেশে বিচার ব্যবস্থার সর্বোচ্চ ধাপ হল সুপ্রিম কোর্ট। দেশে RSS রাজ শুরু হওয়ার পর অনেকেই আশঙ্কা করেছিলেন যে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতো বিচারিক প্রতিষ্ঠানটিও RSS-এর কব্জায় চলে যাবে। আবার অনেকেই মনে করেছিলেন যে সেটা সম্ভব হবে না। মতামত যাই থাক না কেন, দেশের অন্যতম প্রতিষ্ঠান, নির্বাচন কমিশনের সদস্য নির্বাচনে সুপ্রিম কোর্টের ভূমিকাকে ভ্যানিশ করে দেওয়ার যে যাদু RSS দেখিয়েছে তারপর আর কেউ RSS এর ক্ষমতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করতে পারবেন না। আর সন্দেহ না করে পারবেন না, বিচারপতিদের পর্যবেক্ষণ ও রায়দানকে RSS এর রক্তচক্ষুর প্রভাব থেকে মুক্ত থেকে সাংবিধানিক মূল নীতি ও মানবিকতার সুনীতিগুলির উপর আস্থাশীল থাকার উপরেও। ২ ডিসেম্বর ২০২৫ প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত এবং অন্যতম প্রবীন বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীকে নিয়ে গঠিত রোহিঙ্গা বিষয়ক একটি ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ আমাদের উপরোক্ত মতকে জোরালোভাবে সমর্থন করে।

একযুগ আগে মিয়ানমারে সংখ্যালঘু মুসলিম-খ্রিস্টান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর শুরু হয় এক ভয়াবহ আক্রমণ। লক্ষ লক্ষ মানুষ

(জনসংখ্যার প্রায় সবাই) ঘরছাড়া এবং দেশছাড়া। International Court of Justice যাকে জাতিগত নির্মুলীকরণ ও গনহত্যা বলে বর্ণনা করেছে। জাতিসংঘ বলেছে, এই রোহিঙ্গারা বিশ্বের সবচেয়ে নির্যাতিত সংখ্যালঘু। এরপর এই রোহিঙ্গাদের পক্ষে আর কি কিছু বলার দরকার হয় ? এই সময়ে রোহিঙ্গারা হল সবচেয়ে বড় রাষ্ট্রহীন জনগোষ্ঠী। তাদের জনসংখ্যা সঠিকভাবে বলা মুশকিল তবে তা ২০/২৫ লক্ষ হবে। অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে তাঁরা আশ্রয় নিয়েছেন প্রতিবেশি দেশগুলিতে। এর মধ্যে বাংলাদেশে আছে ১২/১৪ লক্ষ, পাকিস্তানে আছে ৫ লক্ষ। আর ভারতে তাঁদের সংখ্যা ৩০ হাজারের আশেপাশে। এদের বেশিরভাগই আবার জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা UNHRC -র কার্ড হোল্ডার। তবে একথা পরিস্কার যে ভারত এই রোহিঙ্গা শরণার্থীদের 'শরণার্থী' হিসাবে স্বীকৃতি দেয় নি, উল্টে তাঁদের অবৈধ অভিবাসনকারী হিসাবে চিহ্নিত করছেন। তালি বাজাচ্ছেন মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের মহামান্য বিচারপতিরা।

শরণার্থী কে তা নির্ণয় করার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে একটি নিয়ম অনুসরণ করা হয়। জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ বা জাতীয়তা গোষ্ঠী; বিশেষ সামাজিক গোষ্ঠী; রাজনৈতিক দলের সদস্য বা মতের সমর্থক গোষ্ঠী; প্রভৃতির যে কোন একটি শরণার্থী হিসাবে গন্য হতে পারে। কোন দেশের সরকার কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে শরণার্থী হিসাবে স্বীকৃতি দিতে পারে। আবার ব্যক্তিগত হিসাবে 'শরণার্থী' হিসাবে নির্ধারিত হওয়ার অধিকার সর্বস্বীকৃত। এভাবেও বলা যায় যে, স্বীকৃতির কারণে কেউ 'শরণার্থী' হয় না বরং সে শরণার্থী বলেই 'শরণার্থী' বলে স্বীকৃতি পায়। অর্থাৎ 'শরণার্থী' নির্ধারণে মানবিকতাই নূন্যতম মাপকাঠি বলে বিবেচিত হওয়ার কথা আর তাই-ই হয়ে থাকে।

মহাচিনের সঙ্গে সুসম্পর্কের ঐতিহাসিক দলিল 'পঞ্চশীল নীতি'র অপমৃত্যুর এবং চীনা আগ্রাসনের আশঙ্কা সত্বেও সদ্যস্বাধীন ভারত মানবিকতার কারনেই দলাই লামা এবং তাঁর অনুগামীদের এদেশে অতিথি হিসাবে আশ্রয় দিয়েছিল এবং এখনও তাঁদের স্বার্থ এবং নিরাপত্তার প্রহরী হিসাবে ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হবে, এটা ধরে নিয়েও ১ কোটি পাকিস্তানবাসীকে বহুদিন ধরে অন্ন-বস্ত্র-আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে গিয়েছে পূর্বতন সরকার। আর আজ সেই ভারতবর্ষের মানুষ সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের এ কি পর্যবেক্ষণ লক্ষ্য করছেন ?

আমাদের দেশে দিল্লীর আশেপাশে যে সব রোহিঙ্গারা বসবাস করেন তাঁদের সবাই ডজ্ঞ্ছট্টঙ্খ-র তালিকাভুক্ত। তাঁদের একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর স্থানীয় থানাতে হাজিরা দিতে হয়। সেখানে তাঁদের ছবি তোলা হয় এবং আঙুলের ছাপ নেওয়া হয়। খবরে প্রকাশ, গত এপ্রিল মাসের ৬ তারিখে দিল্লীর বিভিন্ন এলাকা থেকে ৪০ জন রোহিঙ্গাকে (এর মধ্যে ১৫ জন খ্রিস্টান) এই বায়োমেট্রিক পরীক্ষার জন্য থানায় জড়ো করা হয় এবং তারপর আর তাদের খোঁজ পাওয়া যায় না। বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী ড. রীতা মানচন্দা অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে এই নিখোঁজ মানুষদের পক্ষে আদালতে পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করেন। এই দাবিও করা হয় যে, যদি তাঁদের ফেরত পাঠানো হয় তাহলে সে কাজ যেন আইন মেনে করা হয়। সেই মামলার এক শুনানিতে গত ২ ডিসেম্বর সর্বোচ্চ আদালত এই মন্তব্য করে যে, ক্ষ্মপ্রথমে আপনি সুড়ঙ্গ খুঁড়ে বা বেড়া টপকে অবৈধভাবে ঢুকলেন এবং তারপর আপনি বললেন, এখন আমার উপর ভারতীয় আইন প্রযোজ্য হওয়া উচিত। আমার সন্তানদের জন্য খাদ্য আশ্রয় এবং শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত।ক্ষ্ম অর্থাৎ যেহেতু ভারত সরকারের শরণার্থী হিসাবে তারা স্বীকৃত নয় তাই তারা বেঁচে থাকার জন্য নূন্যতম খাদ্যও পাবে না, পুলিশ হেফাজত থেকে ৪০ জন জলজ্যান্ত মানুষ নিখোঁজ হয়ে গেলেও পুলিশকে কারও কাছে সামান্যতম জবাবদিহিও করতে হবে না, এমনকি আদালতও তাদেরকে কিছু বলবে না। ভারতীয় আইন, আন্তর্জাতিক আইন, মানবাধিকার আইন, কোন কিছুর আওতাতেই এই নিখোঁজ মানুষেরা পড়েন ন। আধুনিক বিশ্বে এও কি সম্ভব? সুপ্রিম কোর্টের সাফ কথা - 'সরকার রোহিঙ্গাদের শরণার্থী হিসাবে স্বীকৃতি দেয় নি'। অতএব তাঁরা অবৈধ অভিবসী। হাত ধুয়ে ফেলনেন সুপ্রিম কোর্ট।

আমরা আগেই বলেছি, কোন দেশের সরকার স্বীকৃতি না দিলেও একজন শরণার্থী 'শরণার্থী' হিসাবে স্বীকৃতি পেতে পারেন। আর সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় বিচারপতিরা এ বিষয়ে অবগত নন, এটা হতেই পারে না। তা সত্বেও তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের সুরে সুর মিলিয়ে অসহায় রোহিঙ্গাদের 'অনুপ্রবেশ'-এর অভিযোগে অভিযুক্ত করলেন যা একান্তভাবেই অভাবনীয়, অপ্রত্যাশিত !

সবচেয়ে মজার বিষয় এই যে অগাস্ট মাসের শেষে আন্তর্জাতিক মিডিয়াতে এই খবর বেরিয়েছে যে, সেই ৪০ জন রোহিঙ্গাকে ৬ মে তারিখেই দিল্লীর একটি ডিটেনশন সেন্টারে রাখা হয় এবং ৭ মে তাদের কোন একটি দ্বীপে আনা হয় বিমানযোগে। সেখান থেকে বাসে চাপিয়ে তাদের একটি বড় জাহাজে তোলা হয়। কিছু পথ গিয়ে তাদের মই দিয়ে নামিয়ে দুটো বোটে তোলা হয়। এরপর ঘন্টা সাতেক চলার পর লাইফ জ্যাকেট পরিয়ে জলে নামিয়ে দেওয়া হয় এবং বলা হয় সাঁতরে তারা ইন্দোনেশিয়ার মাটিতে উঠতে পারবে। পরে জানা যায় সে ভূভাগ আসলে ছিল মিয়ানমারের। স্থানীয় মৎস্যজীবীরা এই মর্মে সাক্ষ দিয়েছেন যে তাঁরা ওই রোহিঙ্গাদের সাঁতরাতে দেখেছেন।

জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিস্থিতি বিষয়ক বিশেষ দূত থমাস এন্ড্রুজ এই বিষয়টা তদন্ত করে দেখেছেন এবং বলেছেন ঘটনার সত্যতা প্রমাণের জন্য উল্লেখযোগ্য তথ্য তাঁর হাতে আছে। জাতিসংঘ এই ঘটনাকে 'অগ্রহণযোগ্য ' বলে ঘোষণা করেছে এবং তদন্তের আহ্বান জানিয়েছে। গোটা ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর মোদি সরকারের তো 'বাত বন্ধ' অবস্থা। অথচ এতো সব ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরেও সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, 'রোহিঙ্গাদের সমুদ্রে ফেলে দেওয়ার গল্পটি রূপকথার মত'। বুঝতে পারছি, রূপকথার থেকেও আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর ঘটনা বাস্তবেও ঘটে। ভবিষ্যতে হয়তো 'RSS ও আদালত' নামক কোন ছায়াছবি প্রত্যক্ষ করার সুযোগ আমাদের হবে।

আমাদের দেশের সংবিধান অনুযায়ী পার্লামেন্টই সবথেকে ক্ষমতাবান। কিন্তু বিচারবিভাগের পরিধিও যথেষ্ট প্রসারিত। সরকার সংবিধান অনুযায়ী চলছে কিনা, সংবিধানের দেওয়া অধিকার ছাড়াও বাড়তি ক্ষমতা প্রয়োগ করছে কিনা, কল্যাণকামী এই রাষ্ট্রে সরকার অকল্যাণকর কোন নীতি-কর্মসুচি প্রয়োগ করছে কিনা, সর্বোপরি সরকার মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে কিনা তা দেখার অধিকার আদালতের আছে। এবং এখানেই এদেশের সংবিধান ও আইন বিভাগের মহিমা। রোহিঙ্গা বিষয়ক মামলার চূড়ান্ত রায় এখনও আসে নি। চূড়ান্ত কথা বলতে আমাদেরও আরও অনেক পথ হাঁটতে হতে পারে। কিন্তু এখনও ভরসা সেই সংবিধান যেখানে দ্বর্থহীন ভাষায় বলা আছে ২১ নম্বর ধারা অনুযায়ী ' রাষ্ট্র সকল মানুষ, সে নাগরিক কিংবা অন্যান্য, আশ্রয় প্রার্থী , বিদেশী প্রত্যেকের জীবন ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ।' একজন নাগরিকের যা প্রাপ্য একজন শরণার্থী বা অনুপ্রবেশকারী তারও তাই প্রাপ্য। এটা কি মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট জানেন না ?

সোনালি বিবি, সুইটি বিবিদের সঙ্গে চুড়ান্ত অমানবিক ব্যবহার

সুকুমার মিত্র

গ্রীষ্মে দিল্লির দহনজ্বালায় কয়েকটি প্রাণ যেন রৌদ্রের তাপে নিঃশেষ হয়ে গেল। হাতে ছিল বৈধ পরিচয়ের দলিল, অথচ রাষ্ট্রের কঠোর শৃঙ্খল তাঁদের গ্রাস করল। অপরাধ ? তাঁদের কণ্ঠে বাংলা ভাষা ও তাঁরা ইসলাম ধর্মাবলম্বী । নিজ দেশেই 'বিদেশি' আখ্যা, সীমান্তের ওপারে বাংলাদেশে নির্বাসন, ভিন দেশের কারাগারে অন্তঃসত্ত্বা মায়ের রক্তশূন্য দিনরাত্রি-এ যেন মানবতার শবযাত্রা। সোনালি বিবি ফিরেছেন, কিন্তু তাঁর পদক্ষেপে ক্লান্তি, শরীরে ক্ষত, মনে অগ্নিদাহ। সুইটি বিবি আজও সীমান্তের ওপারে, তাঁর শিশুদের বুকভরা কান্না নিয়ে। এই কাহিনি শুধু দুটি নারীর নয়; এটি বাংলাভাষী, মুসলিম, দরিদ্র ভারতীয়ের পরিচয়কে সন্দেহের অন্ধকারে ডুবিয়ে দেওয়ার দলিল। সংবিধান যেখানে সমান অধিকারের গান গায়, সেখানে ভাষা ও ধর্ম হয়ে ওঠে অপরাধের চিহ্ন।

১৭ জুন, ২০২৫। হাতে বৈধ নথি, তবু দিল্লি পুলিশের বেআইনি গ্রেপ্তার। তাঁদের 'অপরাধ'? তাঁরা বাংলায় কথা বলে, তাঁরা মুসলিম। এরপর শুরু হয় মর্মান্তিক এক লড়াই;নিজ দেশেই 'বিদেশি' সাজিয়ে অসম সীমান্ত দিয়ে অচেনা অজানা বাংলাদেশের জঙ্গলে পুশ ব্যাক। সেখানে কারাগারে নিক্ষেপ, দীর্ঘ পাঁচ মাসের অপেক্ষা, সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত টেনে আনা এক টুকরো ন্যায়। সোনালি বিবি ফিরেছেন, কিন্তু সুইটি বিবি আজও সীমান্তের ওপারে, তাঁর শিশুদের নিয়ে। এই গল্প শুধু দুটি নারীর নয়; এই গল্প বাংলাভাষী, মুসলিম, গরিব ভারতীয়ের পরিচয়কে 'সন্দেহের' তকমা দেওয়া এক নিষ্ঠুর রাজনীতির। দিল্লি পুলিশের হাতে সেই ভারতীয় নাগরিকদের 'বাংলাদেশী' সন্দেহে গ্রেপ্তার করা হলো যাঁদের হাতে সচিত্র ভোটার পরিচয় পত্র, আধার কার্ড, রয়েছে ১৯৫২ সালের জমির দলিলও। তাঁদের 'অপরাধ'? তাঁরা বাংলায় কথা বলেন, তাঁরা মুসলিম। এরপর শুরু হয় এক মর্মান্তিক ঘন আঁধার অধ্যায়।

এই ঘটনা ভারতের সংখ্যালঘু, বিশেষত বাংলাভাষী মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর অবশ্যই বাঙালি জাতিসত্তার উপর সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক নির্যাতনের নির্মম দলিল। এই ঘটনা দুটি নারীর যন্ত্রণার ঘটনা ফের আর এক বার প্রশ্ন তুলে দিয়েছে যে, 'দেশের চৌকিদারি'র রাজনীতি কতটা সংবিধান ও মানবতা সম্মত। তারা এখন সংবিধানের নির্দেশ জলাঞ্জলি দিয়ে আরএসএস এর দ্বিতীয় সর সঙ্ঘ চালক গোলয়ালকরের নির্দেশ কার্যকর করছে। এই সঙ্ঘ কুলপতি ১৯৩৮ সালে বলেছিলেন এই দেশে মুসলমান ও খ্রিস্টানদের বাস করতে গেলে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হয়ে থাকতে হবে (We and our nation defined)।

অযোধ্যা থেকে বাংলা

কু-রাজনীতির ঘোড় দৌড় মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় ৬ ডিসেম্বর, ২০২৫ 'বাবরি মসজিদ'-এর পাশাপাশি বহরমপুরে আর এক 'রাম মন্দির'-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ছিল ভারতীয় ইতিহাসের এক বিভাজনরেখা।

মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতা, বাংলার সংবাদ মাধ্যমের একটি বড় অংশে সেই খবরই প্রাধান্য পেয়েছে। 'মুসলিমদের চৌকিদার' বলে সম্প্রতি দাবি করছেন, সেই সংখ্যালঘু নেতার রণহুংকার। তাঁর কথায় '৯০টি মুসলিম অধ্যুসিত বিধানসভার আসন' ও 'সোনালি-সুইটি বিবিদের ভোট' এর হিসাব-নিকাশ। কিন্তু সেই 'বিবি'দের যখন রাষ্ট্রযন্ত্র খোদ দেশের রাজধানী নতুন দিল্লিতেই 'বিদেশি' আখ্যা দিয়ে জোর করে সীমান্তের ওপারে বাংলাদেশে ঠেলে দেয় , সেই নিয়ে তিনি মুখ খোলেননি। পথচলার সূচনাতেই সেই নেতার মুখোশ উন্মোচিত হয়ে গিয়েছে- সোনালি বিবি, সুইটি বিবিদের কাছে। বাংলায় কথা বলা এবং ইসলাম ধর্ম পালন;এই দুইয়ের সমন্বয়ই যেন আজকের ভারতে একটি 'অপরাধমূলক পরিচয়'-এ পরিণত হয়েছে। এই স্বঘোষিত সেই মুসলিম নেতা মুখে রা কাটেননি এসব নিয়ে।

পাশাপাশি বহরমপুরে সেই ৬ ডিসেম্বর পাল্টা রাম মন্দির-এর শিলান্যাস একবার ফের যেন জানান দেওয়া- 'হাম কীসি সে কম নেহি'! ১৯৮৬ সাল থেকে 'মন্দির ওহি বনায়েঙ্গে'-র দল, ১৯৯২-এর ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংস করে অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণের পর খুব পরিশ্রম করেও দেশ জুড়ে জোট সরকার গঠন করলেও একক শক্তিতে সর্বত্র তাঁদের রাজনৈতিক দলের ঝাঁপ খোলার শক্তি অর্জন করতে পারেনি। আর এই কারণেই 'রাম ভরোসে' মন্দিরকে ঘিরে সংঘ পরিবারের নির্দেশে সংগঠিত হওয়ার পথেই চলতে হচ্ছে। দিল্লির কেশব ভবনের এটাই ম্যান্ডেট।

বীরভূম থেকে দিল্লি

নাগরিক থেকে 'বাংলাদেশি'-তে রূপান্তরের ট্র্যাজেডি

১৭ জুন, ২০২৫। বীরভূমের পাইকর গ্রামের বাসিন্দা সোনালি বিবি, তাঁর স্বামী, প্রতিবেশী সুইটি বিবি ও তাঁর পরিবার;সব মিলে ছয় জন। দৈনিক জীবন-জীবিকার তাগিদে দিল্লিতে কাজ করছিলেন। তাঁদের সবার কাছেই ছিল বৈধ নথি। কিন্তু দিল্লি পুলিশের কাছে সেই নথির কোনও মূল্য থাকল না। শুধুমাত্র তাঁদের মুখের বাংলা ভাষা এবং মুসলিম পরিচয়ই যথেষ্ট ছিল 'বাংলাদেশি' সন্দেহে গ্রেপ্তারের জন্য। দিল্লির হাজতে কটা দিন থাকার পর, ২৬ জুন, কোনো প্রকার মানবিক প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে, অসম সীমান্ত দিয়ে ভারতীয় নাগরিকদের জোরপূর্বক বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যা কিনা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার এক নগ্ন ও বর্বর প্রকাশ--'পুশব্যাক' নামক একটি অমানবিক শব্দের জীবন্ত প্রতীক!

বাংলাদেশের কারাগারে

বৈধ নথিপত্রের বিড়ম্বনা

সীমান্তের ওপারে, একটি দেশ যাঁর সাথে তাঁদের নাগরিকত্বের কোনো সম্পর্ক নেই, সেখানে তাঁরা 'অবৈধ অনুপ্রবেশকারী'। বাংলাদেশের পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন তাঁরা। সোনালি বিবি অন্তঃসত্ত্বা, বাংলাদেশের চাঁপাই নবাবগঞ্জের জেলে ১০১ দিন কাটালেন। বৈধ নথি থাকা সত্ত্বেও, দুই দেশের আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও উদাসীনতার মধ্যে আটকা পড়েন তাঁরা। প্রয়োজনীয় খাবারের অভাবে সোনালি বিবির রক্তশূন্যতা দেখা দিয়েছে। আত্মীয়দের অভিযোগ, ক্ষুন্নভালোভাবে খেতে দেওয়া হয়নি। তাই রক্তশূন্য হয়ে গেছে। বাড়িতে থাকলে এটা হত না।ক্ষুন্ন এখানেই চূড়ান্ত তামাশা! ভারতীয় রাষ্ট্র যাঁদের 'বাংলাদেশি' বলে বিতাড়িত করল, বাংলাদেশ তাঁদের 'ভারতীয় নাগরিক' হিসেবে আটকে রাখল। তাঁরা পড়ে থাকে দুই দেশের মধ্যকার একটি আইনি-রাজনৈতিক নো-ম্যান'স ল্যান্ডে, যেখানে তাঁদের মানবিক পরিচয় সম্পূর্ণভাবে মুছে গিয়েছে।

কলকাতা হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্ট- নাগরিকপ্রমাণের 'অগ্নিপরীক্ষা'

পরিবারের সদস্যরা যখন বাংলাদেশের কারাগারে প্রিয়জনদের মুক্তির জন্য হাহাকার করছিলেন, তখন তাঁদেরই অন্যান্য সদস্যরা আইনি লড়াই শুরু করেন। কলকাতা হাইকোর্টে এবং পরে হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে মামলা নিয়ে যায় সুপ্রিম কোর্টে । এই মামলা ছিল রাষ্ট্রীয় ঔধ্বত্যের বিরুদ্ধে সংবিধান ও নাগরিক অধিকারের লড়াই। এনিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারে, ২৬ সেপ্টেম্বর হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতিদ্বয় তপোব্রত চক্রবর্তী এবং ঋতব্রত কুমার মিত্র'র ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, ৪ সপ্তাহের মধ্যে সোনালি বিবি-সহ ৬ জনকে ফিরিয়ে আনতে হবে এবং তা করতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকেই। তারপর দীর্ঘ তিন মাস কেটে গেলেও বাংলাদেশেই আটকে থাকতে হয় সোনালিদের। শেষে সুপ্রিম কোর্ট-এর মাননীয় প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তর বেঞ্চ মানবিক কারণে তাঁদের দেশে ফেরানোর নির্দেশ দেয়। আদালতে চলেছে দীর্ঘ আইনি লড়াই। দিন-রাত এক করে দাঁতে দাঁত চেপে মেয়েকে ফেরাতে লড়াই চালিয়ে গেছেন সোনালির বাবা। বারবার অভিযোগ উঠেছে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁদের ভারতে ফেরাতে টালবাহানা করছে! ৫ ডিসেম্বর, প্রায় পাঁচ মাস পর, মালদার মহদিপুর সীমান্ত দিয়ে সোনালি বিবি ও তাঁর শিশু ভারতে ফিরে আসেন। রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস 'আইনি লড়াই ও মানবিকতার জয়' বলে ঘোষণা করেছে। কিন্তু এই 'জয়' কি সত্যিই পূর্ণ? ৬ ডিসেম্বর, অ্যাম্বুলেন্সে করে তাঁকে সরাসরি বীরভূমের গ্রামে নিয়ে আসা হয়। মাত্র দশ মিনিটের জন্য আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা। তারপর

রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি, রক্তশূন্যতা ও শারীরিক দুর্বলতার জন্য। জয়ের এই গল্পে তাই মিশে আছে গভীর বেদনা ও অসম্পূর্ণতা। ভবিষ্যৎ এক নাগরিকের নির্বঘ্নে ভূমিষ্ঠ হওয়ার লাখ টাকার এক প্রশ্ন চিহ্ন!

যাঁরা ফিরলেন না

সুইটি বিবি এবং অপেক্ষার অনিশ্চয়তা

সোনালি বিবির ফেরার আনন্দে ভেসে যেতে পারছে না পাইকর গ্রাম। কারণ, সুইটি বিবি এবং তাঁর দুই নাবালক সন্তান এখনও বাংলাদেশের কারাগারে। সুইটি বিবির মায়ের কণ্ঠে করুণ আর্তি- ক্ষ্মওর ছেলেরা মায়ের অপেক্ষায় বসে রয়েছে। কাঁদছে আর শুধু বলছে, মা কবে ফিরবে?ক্ষ্ম আশ্চর্যের বিষয়, গ্রেপ্তারের সময় সুইটি বিবির মাকেও আটক করা হয়েছিল, কিন্তু তাঁর ভোটার ও আধার কার্ড দেখে ছেড়ে দেওয়া হয়। অথচ একই নথি থাকা সত্ত্বেও সুইটি বিবিকে ছাড়া হয়নি। কেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেননি কেউ। এটি কোনও আমলাতান্ত্রিক ভুল নয়, বরং কেন্দ্রের শাসক দলের একটি নির্বাচনী ও লক্ষ্যযুক্ত ক্ষগ্ধমতার অপপ্রয়োগ। সোনালি ফেরায় সুইটির পরিবারে কিছুটা আশার আলো জ্বলেছে, কিন্তু অনিশ্চয়তার বোঝা এখনও ভারী। ক্ষ্মসোনালি ফিরেছে, আমরা চাই সুইটিকেও ফেরানো হোকক্ষ্ম। একজন মায়ের এই সহজ আকুতি স্বাধীন রাষ্ট্রের কর্ণধারের কানে কি পৌঁছায় না। সোনালি বিবি, সুইটি বিবিদের পরিবারের 'মন কি বাত' কে বা কারা শুনবেন?

'চৌকিদারি', নিন্দা ও নীরবতা

রাজ্যসভার তৃণমূল সাংসদ সামিরুল ইসলাম সঙ্গতভাবেই বলেছেন, ক্ষ্মমোদি সরকার এখন ইংরেজ শাসকদের মতো ব্যবহার করছে। বাংলা ভাষায় কথা বললেই অত্যাচার করা হচ্ছে।ক্ষ্ম রাজ্যের মন্ত্রীরা এটিকে 'ঘৃণ্য চক্রান্ত' ও 'পরিকল্পিত রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা' হিসেবেই দেখছেন। অপরদিকে, জাতীয় পর্যায়ে বিরোধী দলগুলির কণ্ঠে তেমন জোরালো নিন্দা বা প্রতিবাদ শোনা যায়নি। গোটা ঘটনায় একটি গভীর নীরবতা ও উদাসীনতা কাজ করেছে। যেন বাংলাভাষী, দরিদ্র, মুসলিম নারীদের নাগরিকত্ব হারানো একটি 'স্থানীয়' বা 'গৌণ' বিষয়। এই নীরবতাই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর, কারণ এটি রাষ্ট্রীয় অন্যায়কে স্বাভাবিক করে তুলছে ক্রমশ। দেশ জুড়ে 'দেশের চৌকিদার'- দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, দলিত, পিছিয়ে পড়া মানুষদের সঙ্গে ক্রীতদাসের মত ব্যবহার করছেন। আর এটাই ক্রমশ গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে একাংশ নাগরিকের কাছে। হবেই বা না কেন মিডিয়া যেখানে গণতন্ত্র-এর চতুর্থ স্তম্ভের কাজ করতে পারে না বলা ভালো কর্পোরেট স্বার্থে দেশের শাসক দলকে খুশি করার সহজ পথ বেছে নিয়েছে। বিকল্প স্বর হিসেবে নাগরিক সাংবাদিকতা আর পাঁচটা দেশের মতো এখনও সমান্তরাল বা এগিয়ে থাকা শক্তি হিসেবে উঠে আসেনি- সেই দেশে এটাই স্বাভাবিক। প্রাসঙ্গিকভাবেই মনে পড়ে যায় বিশ্বকবির সেই কবিতা ---

হে মোরদুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান
মানুষের অধিকারে
বঞ্চিত করেছ যারে,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুর
বিধাতার রুদ্ররোষে
দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে
ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান।
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

....

দেখিতে পাও না তুমি মৃত্যুদূত দাঁড়ায়েছে দ্বারে,
অভিশাপ আঁকি দিল তোমার জাতির অহংকারে।
সবারে না যদি ডাক',
এখনো সরিয়া থাক',
আপনারে বেঁধে রাখ' চৌদিকে জড়ায়ে অভিমান--
মৃত্যুমাঝে হবে তবে চিতাভস্মে সবার সমান ।।

নিয়োগ সমস্যা: কমিশন ও কোর্টের পাকানো জটে সমাধান সুদূর পরাহত

মজিবুর রহমান

পশ্চিমবঙ্গের সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা প্রায় সবসময়ই কোনো না কোনো কারণে আলোচনার মধ্যে থাকে। কংগ্রেসের আমলে পরীক্ষায় গণটোকাটুকি এবং বামফ্রন্টের আমলে প্রাথমিক থেকে ইংরেজি ও উচ্চ প্রাথমিক পর্যন্ত পাশ ফেল তুলে দেওয়া ছিল উল্লেখযোগ্য আলোচ্য বিষয়। তৃণমূলের আমলে মুখ্য আলোচ্য বিষয় হয়েছে

নিয়োগ দুর্নীতি। কংগ্রেস ও বাম আমলে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী নিয়োগে আত্মীয়স্বজন ও দলীয় কর্মীদের প্রতি বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির কর্মকর্তাদের পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শনের একটা রীতি চালু ছিল।কিছু কিছু চাকরিপ্রার্থী একটুখানি নেতা ধরতে ও বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো উন্নয়নে অল্পস্বল্প অর্থসাহায্য করতে বাধ্য হতেন। ১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত বামফ্রন্ট সরকার ১৯৯৮ সালে স্কুল সার্ভিস কমিশন প্রণয়নের মাধ্যমে এসব অনিয়ম ও অসদাচরণের অবসান ঘটায়। কিন্তু এক যুগ ধরে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে এসএসসি'র মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়া পরিচালিত হওয়ার পর গত দেড় দশকে সেই সুন্দর ব্যবস্থার কার্যত অপমৃত্যু ঘটেছে।

২০১৬ সালের প্যানেল বাতিল এবং ২০২৫ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়া প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ার পেছনে স্কুল সার্ভিস কমিশন তথা সরকারের শয়তানির সাথে সাথে আদালতের দায়সারা ও স্ববিরোধী নির্দেশাবলী অনেকাংশে দায়ী। সরকার শঠতা করেছে আর আদালত সুবিবেচনার পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়েছে। সিবিআই ওএমআর মিসম্যাচ, রাঙ্ক জাম্পিং, এক্সপায়ারি অফ প্যানেল, আউট অফ প্যানেল, সুপার নিউমারি পোস্ট প্রভৃতি নানাবিধ কারচুপির মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের চিহ্নিত করে। মোট ২৬ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর মধ্যে এরূপ চিহ্নিত 'দাগী'র (টেন্টেড) সংখ্যা ৮ হাজারের কম। যাদের ক্ষেত্রে কোনো রকমের কারচুপি ধরা পড়েনি তাদের 'দাগহীন' (আনটেন্টেড) বলে গণ্য করাই যুক্তিযুক্ত। সেই হিসেবে আনটেন্টেডের সংখ্যা ১৭ হাজারের বেশি। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চ যদি পুরো প্যানেল বাতিল না করে শুধু দাগীদের বরখাস্ত করার নির্দেশ দিতেন তবে তা অধিকতর মানবিক, যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায়সম্মত হত। তাহলে নির্দোষ শিক্ষকরা চাকরিতে বহাল থাকতে পারতেন। দাগীদের জায়গায় ওয়েটিং লিস্ট থেকে 'যোগ্য বঞ্চিত'রা নিযুক্ত হতেন। সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। কিন্তু যেহেতু এসএসসি সুনির্দিষ্টভাবে টেন্টেড-আনটেন্টেড পৃথকীকরণ করেনি অথবা আনটেন্টেডদের মধ্যে আর কোনো টেন্টেড নেই- এই মর্মে এফিডেভিট জমা দেয়নি তাই আদালত অপরাধীদের সঙ্গে নিরপরাধদেরও চাকরি 'নট' করে দিল। মুড়ি মুড়কি এক হয়ে গেল। এ কেমন বিচার! আদালতের সঙ্গে অসহযোগিতা করল দুর্নীতিগ্রস্ত কমিশন, দুর্নীতির আশ্রয় নিলেন ৮ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী কিন্তু দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত না থেকেও ১৭ হাজার শিক্ষক শাস্তি পেলেন। ৩.৪.২৫ তারিখ সিজেআই সঞ্জীব খান্না ও বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের ডিভিশন বেঞ্চ কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের রায় বহাল রাখে এবং ৩১.১২.২৫ তারিখের মধ্যে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার নির্দেশ দেয়। আদালতের রায় অনুযায়ী, ২০১৬ সালের পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে ওই সময়ের ঘোষিত শূন্য পদের জন্য ওই সময়ের বিধি মেনে এই পরীক্ষা হওয়া কথা। আদালত দাগীদের পরীক্ষায় বসার ব্যাপারে কঠোরভাবে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। কিন্তু স্কুল সার্ভিস কমিশন ২৯.৫.২৫ তারিখ সম্পূর্ণ নতুন বিধি প্রণয়ন করে। পরদিন নতুন ও পুরনো চাকরিপ্রার্থীদের সকলের একসাথে পরীক্ষা গ্রহণ করার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। নতুন বিধি ও বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্টতই আদালতের নির্দেশ গুরুতরভাবে লঙ্ঘন করা হয়। কিন্তু দিন দশেকের মধ্যেই যখন এই বিজ্ঞপ্তির ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় তখন প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার অবসরগ্রহণের পর গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ কোনো হস্তক্ষেপ করতে চায়নি। বিচারপতি সঞ্জয় কুমার তাঁর নির্দেশের পরিপন্থী গেজেট দেখেও নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বাধা দেননি। ২৮.১১.২৫ তারিখ তিনিই তাঁর অবস্থান থেকে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে ২০২৫ সালের বিধিমালার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন এবং মামলাটি হাইকোর্টে ফেরত পাঠালেন। সেই সঙ্গে এই মামলার ব্যাপারে ৩.৪.২৫ তারিখের পরবর্তীকালে তাঁর প্রদান করা নির্দেশাবলীকে গুরুত্বহীন বলে জানালেন। এ তো একেবারে সুপ্রিম প্রহসন! বিচার প্রক্রিয়ায় আইনগত যুক্তিতর্ক বাদ দিয়ে বিচারপতির মন মেজাজ মর্জি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে / উঠলে তো মুশকিল!

স্কুল সার্ভিস কমিশন যে নতুন বিধিমালা তৈরি করে নভেম্বর মাসে পরীক্ষা নিয়েছে তা অত্যন্ত অযৌক্তিক ও অভিসন্ধিমূলক। কোনো নিয়োগ প্রক্রিয়ায় এর আগে এত জঘন্য রুল্স তৈরি করা হয়েছে বলে মনে হয় না। অতি অদ্ভুত নম্বর বিভাজনের কারণে বহু পরীক্ষার্থী লিখিত পরীক্ষা ও একাডেমিকে ১০০ শতাংশ করে নাম্বার পাওয়ার পরও কাট অফ ক্লিয়ার করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যে দুর্নীতির জন্য প্যানেল বাতিল হয়েছে সেই দুর্নীতিকেই আরও প্রসারিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে ইন্টারভিউ ও ডেমন্সট্রেশনে ১০, ১০ মোট ২০ নাম্বার বরাদ্দ করে। এক্সপেরিয়েন্স নাম্বারও সাধারণত প্রমোশনাল পোস্টের জন্য দেওয়া হয়ে থাকে, একই পদের পরীক্ষায় নয়।

স্কুল সার্ভিস কমিশন স্বশাসিত সংস্থা হলেও সরকারের পরামর্শ ও নির্দেশ মোতাবেক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ২০১৬ সালের এসএলএসটি'তে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি হয়েছে। কোটি কোটি টাকার নিয়োগ দুর্নীতিতে শাসকদলের নেতা মন্ত্রীদের সঙ্গে এসএসসি'র কর্তাব্যক্তিরাও জড়িত। এই দুর্নীতির শিকড় অনেক গভীরে। আদালত বললেও এসএসসি'র পক্ষে এখন হঠাৎ করে সাধু হওয়া সম্ভব নয়। বেহায়া না হয়ে তাদের উপায় নেই। তারা সচেতনভাবেই আদালতের

নির্দেশ বাইপাস করবে, অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে না। তাদের কাজে ফাঁকফোকর ও গোঁজামিল থাকবেই। এসব ধরতে ধরতে আদালত ক্লান্ত হয়ে যাবে। 'তারিখ পে তারিখ' চলতেই থাকবে। নিয়োগ প্রক্রিয়ার জট কোনোদিনই কাটবে না।

নিয়োগ প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত করতে হলে হাইকোর্টের তত্ত্বাবধানে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করা ছাড়া উপায় নেই। কমিটিতে আইনজ্ঞ , শিক্ষাবিদ, স্কুল শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের রাখা হোক। প্রশ্নপত্র রচনা, পরীক্ষা গ্রহণ, উত্তরপত্র মূল্যায়ন, কাট অফ নির্ধারণ, ইন্টারভিউ গ্রহণ, মেরিট লিস্ট ও ওয়েটিং লিস্ট প্রকাশ পুরোটাই পরিচালনা করুক এই কমিটি। ২০২৫ সালের বিধিমালায় যত অসঙ্গতি ও কাট অফ নির্ধারণে অবাস্তবতা রয়েছে এবং এই পরীক্ষায় দাগীদের অংশগ্রহণের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে তাতে এই নিয়োগ প্রক্রিয়াকে জীবিত রেখে সমাধানের সূত্র অনুসন্ধান করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে। ৩.৪.২৫ তারিখ প্যানেল বাতিলের দিন থেকেই সরকারি হাইস্কুলগুলো একটা ছন্নছাড়া অবস্থার মধ্যে পড়ে। ১৭.৪.২৫ তারিখ সুপ্রিম কোর্ট মধ্যশিক্ষা পর্ষদের আবেদনের ভিত্তিতে স্কুলের স্বার্থে আনটেন্টেড টিচারদের ৩১.১২.২৫ তারিখ পর্যন্ত চাকরিতে বহাল রাখার অনুমতি দেয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে স্কুলের অবস্থার বিশেষ কোনো উন্নতি ঘটেনি। চাকরিহারা শিক্ষকরা মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ায় আগের মতো স্কুলে আসেননি। তাঁরা আইনি লড়াই, রাজপথে আন্দোলন, আগের চাকরিতে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা ও নতুন পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত থেকেছেন। তাঁদের স্কুল আসা-যাওয়া ভীষণ অনিয়মিত ও অনিশ্চিত থেকেছে। উপস্থিতি-অনুপস্থিতির নিয়মকানুন (লিভ রুল্স) মেনে চলা সম্ভব হয়নি। এসব নিয়ে স্টাফ রুমে সহকর্মীদের সঙ্গে বাকবিতণ্ডা হয়েছে। নতুন শিক্ষাবর্ষে যাতে এরূপ পরিস্থিতি বজায় না থাকে তা নিশ্চিত করা দরকার।

শুধুমাত্র দুর্নীতির কারণেই পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, এমনটা মনে করা ঠিক হবে না। আসলে বিভিন্ন বিভাগে কর্মচারী নিয়োগের ব্যাপারে সরকারের নীতি ও কৌশলের কারণেই এই বিতর্কিত ও বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সরকার স্থায়ী পদে ও পূর্ণ বেতন কাঠামোর সুবিধাভোগী কর্মচারী নিয়োগ করতে আগ্রহী নয়। এখন সমস্ত সরকারি অফিসের অধিকাংশ কাজ ক্যাজুয়াল বা কন্ট্রাক্টুয়াল কর্মীরা করেন। সস্তার শ্রমিক দিয়ে কাজ তুলে নেওয়াই সরকারের লক্ষ্য। এই নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই সরকার শিক্ষা ব্যবস্থার বেসরকারিকরণ চাইছে। এজন্য সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার বারোটা বাজানোর প্রক্রিয়া চলছে। সরকারের উদ্দেশ্য সাধনে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে এসএসসি। বামফ্রন্টের আমলে সুখ্যাতি অর্জনের পর তৃণমূল সরকারের আমলে নিয়োগ প্রক্রিয়াকে সাংঘাতিকভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত করে এসএসসি কুখ্যাত হয়ে উঠেছে। যে এসএসসি একসময় হবু শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের জন্য ছিল 'স্বপ্ন সার্থক কমিশন' এখন তা হয়েছে 'স্বপ্ন স্থগিত কমিশন'। সরকারের সদিচ্ছার অভাবেই নিয়োগ বাতিল বা বন্ধ হচ্ছে।

সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্য সাধারণ মানুষকে সোচ্চার হতে হবে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে ঐক্যশ্রী, শিক্ষাশ্রী, কন্যাশ্রী কিংবা সবুজ সাথীর সাইকেল বিতরণ করে শিক্ষা ব্যবস্থাকে রক্ষা করা যাবে না। এজন্য বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো উন্নয়ন সহ নিয়মিতভাবে শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। কিন্তু বর্তমানে নতুন শিক্ষক পদ সৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে। অনুমোদিত শিক্ষক পদের অন্তত এক-তৃতীয়াংশ শূন্য পড়ে রয়েছে। বিদ্যালয়ে শিক্ষা বহির্ভূত কাজ বাড়ছে। সবমিলিয়ে ধারাবাহিক ভাবে পড়াশোনার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। স্কুল-কলেজে ছাত্র ভর্তি কমছে। সাক্ষরতার হার বাড়ছে না। পড়াশোনা করেও চাকরিবাকরি নেই। যে কটা চাকরি হচ্ছে সেখানেও দুর্নীতির দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। এই অসুস্থ পরিবেশ থেকে বেরিয়ে আসা ভীষণ জরুরি। সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস হলে জনসাধারণের শিক্ষা অর্জনের সুযোগ সঙ্কুচিত হবে যা অদূর ভবিষ্যতে সাধারণ মানুষের জীবনমানের ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব ফেলবে।

(লেখক মুর্শিদাবাদ কাবিলপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ।)

সঞ্চারসাথী অ্যাপ : প্রতিবাদের মুখে মোদী সরকারের ইউ টার্ন

শুভাশিস মজুমদার

১ ডিসেম্বর, সংসদ শুরুর দিন, সংসদ চত্বরে, প্রায় নির্বাচনী ঢঙ্গে ভাষণ দেওয়ার সময় মোদী ব্যাঙ্গ করে কংগ্রেস তথা অন্য বিরোধী দল গুলির সরকার বিরোধী আন্দোলনকে ড্রামা বলেছিলেন। আর ঠিক তার দুদিন পরে কংগ্রেস তথা বিরোধীদের জোরালো বিরোধিতার চাপে সঞ্চারসাথী অ্যাপ নিয়ে সরকারি আদেশ বাতিল করতে বাধ্য হল কেন্দ্রীয় সরকার।

কি এই সরকারি সঞ্চারসাথী অ্যাপ কোন? আশঙ্কায় এর বিরোধিতা করা হল শুধুমাত্র কংগ্রেস বা বিরোধী দল গুলির তরফে নয়, ইন্টারনেট ফ্রিডম ফাউন্ডেশন এবং অ্যাপল থেকে স্যামসাং- এর

মত মোবাইল নির্মাতা সংস্থাগুলির পক্ষ থেকেও। গুগল ও এর বিরোধিতা করে শুরুটা হয়েছিল ২৪ নভেম্বর একটি সংবাদ প্রকাশের মধ্য দিয়ে। ঐদিন টেলিকম দপ্তর (ডট) এক বিবৃতি দিয়ে জানায় যদি কারো নাম ও পরিচয় পত্র দিয়ে কেনা সিম ব্যবহার করে কোন অপরাধ করা হয় তাহলে সেই গ্রাহককেও (যাঁর নাম, পরিচয় ব্যবহার হয়েছে) সেই অপরাধের সাজা ভোগ করতে হতে পারে। সেই কারণেই নিয়মিত নিজের নামে অন্য কোন সিম কার্ড কেনা হয়েছে কিনা তা সঞ্চারসাথী অ্যাপের মাধ্যমে দেখার পরামর্শ দিয়েছে তারা। এরপরেই আশঙ্কিত গ্রাহকদের অনেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাঁদের বক্তব্য, ভুয়ো ফোন, মেসেজ- এর ফলে জালিয়াতদের খপ্পরে পড়ে এমনিতেই ভোগান্তির শেষ থাকে না। গোপন তথ্য চুরি থেকে শুরু করে কষ্টের সঞ্চয় হারাতে হয় বহু মানুষকে। এবার ডটের বিবৃতি তাঁদের আরো চিন্তায় ফেলবে, বিশেষত অন্যের অপরাধের সাজা নিরাপদ মানুষকে কেন ভোগ করতে হবে, এই প্রশ্ন উঠছে। দাবি উঠছে, গ্রাহক সুরক্ষায় তদন্তকারীরা বা নীতি প্রণেতারা ব্যবস্থা গ্রহণ করুন, গ্রাহকের উপর দায় না চাপিয়ে।

বেশ কিছুদিন ধরেই মোবাইল ফোনে গ্রাহকেরা টেলিকম বিভাগের কাছ থেকে লাগাতার এসএমএস পাচ্ছিলেন যে জালিয়াতি রুখতে অথবা হারিয়ে যাওয়া ফোন ফিরে পেতে তাঁরা যেন মোবাইলের সঞ্চারসাথী অ্যাপ অবিলম্বে ডাউনলোড করেন। সংবাদে প্রকাশ, ইতিমধ্যেই এই এসএমএস প্রচারের প্রভাবে প্রায় ৫০ লক্ষ গ্রাহক সঞ্চারসাথী অ্যাপ তাঁদের মোবাইলে ডাউনলোড করেছেন। ১ ডিসেম্বর, জানা গেল, কেন্দ্রীয় সরকারের টেলিকম বিভাগ নির্দেশিকা জারি করে সমস্ত মোবাইলে সঞ্চারসাথী অ্যাপ বাধ্যতামূলক করেছে। এমনকি সম্প্রতি সমস্ত ফোন নির্মাতা সংস্থাকে টেলিকম বিভাগ চিঠি দিয়ে নির্দেশ দিয়েছে যে এখন থেকে যেকোনো মোবাইল তৈরির সময়েই তাতে বাধ্যতামূলকভাবে থাকতে হবে সঞ্চারসাথী অ্যাপ। সেই অ্যাপ যাতে চাইলেও মোছা (আনইন্সটল) না যায় সেই প্রযুক্তিও রাখতে হবে। ডট জানিয়েছে, নির্দেশ না মানলে টেলিকম আইন মোতাবেক সংস্থার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে। এই খবর সামনে আসতেই বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়ে যায়। কংগ্রেস নেতা কেসি বেনুগোপালের দাবি, ডটের নির্দেশ অসাংবিধানিক। সংবিধান অনুযায়ী গোপনীয়তা প্রত্যেক মানুষের অধিকার। মুছে ফেলা যাবে না এমন সরকারি অ্যাপ আগে থেকে ফোনে রাখার নির্দেশ আদতে সকলের উপর সরকারের নজরদারি চালানোর পন্থা। প্রত্যেক দেশবাসীর প্রতিটা পদক্ষেপ আলাপ আলোচনা এবং সিদ্ধান্তে নজর রাখার প্রচেষ্টা। তিনি দাবি করেন অবিলম্বে এই নির্দেশ প্রত্যাহার করতে হবে। সঞ্চারসাথী অ্যাপ মোবাইলে ইনস্টল হলে, এই অ্যাপ ওই মোবাইলের এসএমএস বা এম এম এস দেখবে, এসএমএস পাঠাতে পারবে, কল লগ পড়তে পারবে, ফোনের অবস্থান এবং বিশদ বিবরণ পড়তে পারবে, ইউ এস বি এ স্টোরেজের বিষয়বস্তু পড়তে পারবে। বিষয়বস্তু বদলাতে বা মুছে ফেলতে পারবে, ছবি এবং ভিডিও তুলতে পারবে, নেটওয়ার্ক সংযোগ দেখবে, ফ্ল্যাশ লাইট নিয়ন্ত্রণ করবে, নেটওয়ার্কের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ পাবে, সংশ্লিষ্ট মোবাইলের ইন্টারনেটকে কাজে লাগিয়ে বিনা বাধায় নির্দিষ্ট কাজে লাগাতে পারবে, ভাইব্রেশন নিয়ন্ত্রণ করবে।

এর আগে মোদী সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল রাহুল গান্ধী, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়- এর মত বিরোধী দলনেতা, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি, আইনজীবী, সমাজকর্মীদের মোবাইলে ইজরায়েলের পেগাসাস স্পাইওয়্যার কাজে লাগিয়ে আড়ি পাতা হয়েছে। এলগার পরিষদের মামলায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা স্পাইওয়্যার কাজে লাগিয়ে সমাজকর্মীদের ল্যাপটপে বিতর্কিত নথি ঢুকিয়ে দিয়েছিল বলেও অভিযোগ উঠেছিল।

মোদী সরকারের সঞ্চারসাথী অ্যাপ নিয়ে এই পদক্ষেপকে ‘নির্লজ্জ’ আখ্যা দিয়ে কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধি অভিযোগ করেন, ‘দেশের নাগরিকদের গোপনীয়তা, ব্যক্তি পরিসরের অধিকার রয়েছে। কেউ নিজের আত্মীয়, বন্ধুদের মেসেজ করতে পারেন তাতে সরকার কেন নজরদারি করবে? এই সরকার সব রকম ভাবে দেশটাকে স্বৈরতান্ত্রিক করে ফেলতে চাইছে।’

সিপিএম সাংসদ জন বৃট্টাসের কটাক্ষপূর্ণ মন্তব্য,ক্ষ্মএরপরে মোদী সরকার মানুষের মস্তিষ্কে চীপ বসিয়ে লোকে কি ভাবছে তাতেও নজরদারি করতে চাইবে।’

এই নজরদারির বিরুদ্ধে বিরোধীদের প্রতিবাদ, সুপ্রিম কোর্টের রায় সত্ত্বেও ব্যক্তি পরিসরের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ এবং অ্যাপেল থেকে স্যামসাংয়ের মতো মোবাইল নির্মাতা সংস্থাগুলির এই নির্দেশ পালনে অসম্মতির ফলে সরকার সঞ্চারসাথী অ্যাপ ব্যবহার বাধ্যতামূলক থেকে বদলে ‘ঐচ্ছিক’ হিসেবে ঘোষণা করেছে।

কংগ্রেসের মুখপাত্র পবন খেরা সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেন, বিজেপি এবার ‘ঘর ঘর মোদী’- র স্লোগান বাস্তবায়িত করতে চাইছে। দেশের মানুষের শয়নকক্ষে নজরদারি করতে চায় তারা। তিনি দাবি জানান, ‘শুধু মৌখিকভাবে নয়, লিখিতভাবে এই নির্দেশ প্রত্যাহার করতে হবে।’

প্রতিবাদের মুখে, আন্দোলনের মুখে, মোদী সরকার এর আগেও

বহু ক্ষেত্রের সিদ্ধান্তে বা আইন প্রণয়নে ইউ টার্ন নিয়েছে। যার মধ্যে,কংগ্রেসকে ব্যাঙ্গ করেও মনরেগা চালু রাখা, প্রথমে বিরোধীতা করেও পরে জাতি জনগণনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কৃষি আইন প্রত্যাহার, জিএসটি সংস্কার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

রাজ্যে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ

শুভ মিত্র

অবশেষে প্রকাশিত হল বিশেষ নিবিড় সংশোধন উত্তর পশ্চিমবঙ্গের খসড়া ভোটার তালিকা। ৭,৬৬,৩৭,৫২৯ জনের নাম ছিল সর্বশেষ ভোটার তালিকায়। খসড়া তালিকায় নাম আছে ৭,০৮,১৬,৬৩১ জনের নাম।

যেটুকু জানা গেছে ৫৮,২০,৮৯৮ জনের নাম বিভিন্ন কারণে বাদ গিয়েছে।যার মধ্য মৃত ভোটারের সংখ্যা ২৪,১৬,৮৫২ জন,অনুপস্থিত ১২,২০,০৩৮ জন,ঠিকানা বদল হয়েছে ১৯,৮৮,০৭৬ জনের,ডুপ্লিকেট ভোটারের সংখ্যা ১,৩৮,৩২৮ ও অন্যান্য কারণে বাদ পড়েছেন ৫৭,৬০৪ জন।

অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা সম্পর্কে নিরুত্তর কমিশন।

এই তালিকা পাওয়া যাবে জেলাশাসক ও মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরে ও ইসিআই নেট ওয়েবসাইটে। এছাড়া প্রতিটি বিধানসভার বুথেও তা টাঙিয়ে দেওয়া হবে ও বিএলওদের অ্যাপেও পাঠানো হবে। প্রতিটি স্বীকৃত রাজনৈতিক দলকেও ছাপানো তালিকা দেওয়া হবে। ভোটার কার্ডের নম্বর দিয়ে তা সার্চ করতে হবে।

যাদের নাম নেই অথচ ফর্ম ভরেছিলেন তাদের জন্য নোটিশ পাঠানো হবে। তারপর শুরু হবে শুনানিপর্ব। যা হবে জেলাশাসক, এসডিও ও বিডিও অফিসে বা নিকটস্থ কোন সরকারি অফিসে।

ম্যাপিং না থাকা ৩০,৫৯,২৭৩ জন ছাড়া পুনর্যাচাইয়ের আওতায় থাকা প্রায় এক কোটি ছত্রিশ লক্ষ ভোটারের একটা অংশও এই নোটিশ পাবেন। পিতা মাতার তথ্য গরমিলের ক্ষেত্রে ও বাস্তবসম্মত না হলে এই নোটিশ আসবে।তালিকাভুক্ত ১৩ টি নথির মধ্য যেকোন একটি নথি জমা দিতে হবে।

১৬ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ১৫ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত যে কেউ বা রাজনৈতিক দলগুলি আপত্তি, অভিযোগ বা দাবী জানাতে পারবে। খসড়া তালিকায় নাম না থাকলে কেউ অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন ফর্ম-৬ পুরণ করে। সঙ্গে অ্যানেক্সচার -৪ জমা দিতে হবে। তথ্য সংশোধনের জন্য ফর্ম-৮ লাগবে।এই কাজ চলবে আগামী বিধানসভা মনোনয়নের আগে পর্যন্ত।

নাম খসড়া তালিকায় আছে কিনা তা দেখার জন্য নীচের ওয়েবসাইট টি দেখতে হবেঃ

https://electoralsearch.eci.gov.in/

বাদ যাওয়ার তালিকাটি এই ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবেঃ

https://ceowestbengal.wb.gov.in/asd_sir

রাহুল গান্ধি সম্পর্কে ভীতি, লোকসভায় তাঁর বক্তব্যে বারংবার বাধাদান

অমিতাভ সিংহ

এবারের সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে বিরোধী দলগুলির নেতারা একযো পরগে যেভাবে বিজেপি সরকারের কাজকর্ম নিয়ে তীক্ষ্ণ সমালোচনা করে চলেছেন তা বিরল বলেই মনে হচ্ছে।রাহুল গান্ধী যে সুরটা প্রথমেই বেঁধে দিয়েছেন তার ওপর দাঁড়িয়ে অখিলেশ যাদব , প্রিয়ঙ্কা গান্ধী, মহুয়া মৈত্ররা তাঁদের অস্ত্র শানিয়ে চলেছেন।

এই অধিবেশনে রাহুল গান্ধী যখন বক্তব্য রাখছিলেন তখন বিজেপির সাংসদেরা বারংবার চেঁচামিচি করে তাঁর বক্তৃতায় বাধা দিয়েছে৭ হয় ৮ন। অমিত শাহ,রাজনাথ সিং,কিরন রিজেজু,নিশিকান্ত দুবে এমনকি খোদ মোদীও অন্তত ১০ বার Point of order তুলে দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে বাধা দিয়েছেন।এতে তাঁদের দলীয় সদস্যরা অবিরত উৎসাহিত হয়েছেন। রাহুলের বক্তব্যের সময়ের চেয়ে চেঁচামেচি ও হট্টগোলের সময় অনেকটাই বেশী।ফলে জনগণের অর্থে চলা সংসদে দেশের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরার সময়টাও হয়েছে কম।আসলে দেশে বহুবিধ সমস্যা সমাধানে বিজেপি সরকারের ব্যর্থতা ও নিজেদের অকর্মণ্যতা ঢাকতে সব জায়গায় গায়ের ও গলার জোরই এদের প্রধান শক্তি।

রাহুল বক্তব্য রাখতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই অনেকক্ষণ ধরে চলল বিজেপি সাংসদদের প্রবল চিৎকার। মাঝে মাঝে ‘জয় সংবিধান’ শব্দবন্ধটি কানে এল।যারা নিজেদের জন্মলগ্ন থেকে সংবিধান মানে না তাদের কণ্ঠে এই ধ্বনি অনেকটা ভুতের মুখে রামনাম ছাড়া আর কিইবা বলা যায়। রাহুল সেটা ধরে নিয়ে বলতে শুরু করলেন এই বলে যে, এই সংবিধান আমরা রক্ষা করছি। পরিকল্পিত পদ্ধতিতে ভারতের সংবিধানের ওপর আক্রমণ হয়ে চলেছে যাকে আমরা ভারতের আত্মার , ভারতভাবনার ওপর আক্রমণ হিসাবে দেখছি। যে বা যারা এটা প্রতিরোধ করতে এগিয়ে এসেছেন তাদের ওপর

ব্যক্তিগত আক্রমণ নেমে এসেছে। দলিত,সংখ্যালঘু, দরিদ্র,আদিবাসী সবচেয়ে বেশী ভুক্তভোগী। ভয় দেখানো, কারাবাসসহ হরেকরকম পদ্ধতি প্রয়োগ করে তাদের মুখ বন্ধ করা হচ্ছে। আমাকেও ইডি পঞ্চান্ন ঘন্টা জেরা করে ভয় দেখাতে চেয়েছিল। জেলে ঢুকিয়েছে, সাংসদপদ কেড়ে নিয়েছে,বাড়ী থেকে বের করে দিয়েছে।তাও আমি তাদের ভয়ে পিছু হটিনি। তার বক্তব্য যত এগিয়েছে ততই সরকার বেঞ্চ থেকে প্রবল প্রতিরোধ ও হট্টগোল দেখা গেছে।রাহুল যখন শিবঠাকুরের ছবি দেখিয়ে সত্যের তিন আদর্শ বা ধারণা বর্ণনা করতে আরম্ভ করেন তখনও একই দৃশ্য। খোদ স্পীকার ওম বিড়লা এই ছবি দেখানোয় আপত্তি করেন। শিবঠাকুরের হাতের ভঙ্গিমাটিকে রাহুল অভয়মুদ্রা বলে বর্ণনা করে বলেন এর অর্থ' ডরো মাত, ডরাও মাত।'

এটাই কংগ্রেসের আদর্শ ও প্রতীক। যীশুখ্রিস্ট, গুরু নানক,বুদ্ধদেব,মহাবীর বলেছেন ' ডরো মাত , ডরাও মাত ' অর্থাৎ ভয় পেয় না,ভয় দেখিও না। ভারত অহিংসার দেশ,ভয়ের দেশ নয়।আর আমাদের দেশে এখন যারা নিজেদের হিন্দু বলে প্রচার করে তারা হিংসা ও ঘৃণা ছড়াচ্ছে। এটা মনে রাখতে হবে আরএসএস বা মোদী পুরো হিন্দু সমাজের প্রতিনিধি নয়। অযোধ্যা বিজেপিকে লোকসভা নির্বাচনে পরাজিত করে দেশকে একটা বার্তা দিয়েছে। গরীব, সাধারণ মানুষ, ছোট দোকানদারদের জমি ও জীবিকা ছিনিয়ে নিয়ে তাদের বাড়ীঘর ভেঙে তাদের রাস্তায় নামিয়ে দিয়েছে ।

সেনাদের মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা এই অগ্নিবীর প্রকল্প।৬ মাস মাত্র প্রশিক্ষণ নিয়ে যুদ্ধ করতে গিয়ে এদের মৃত্যু হলে না পাবেন পেনশন , না পাবেন ক্ষতিপূরণ, না পাবেন শহীদের সম্মান।সেনার ভাবনায় এই প্রকল্পটি হয় নি, প্রকল্পটি মোদীর মস্তিষ্কপ্রসূত।

মনিপুরে কুকি ও মৈতে' দের মধ্য আড়াই বছর ধরে সংঘর্ষ ও হিংসা চলছে,মহিলাদের উলঙ্গ করে রাস্তায় হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়ার ছবি সংবাদমাধ্যমে দেখা গেছে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী একবারের জন্যেও ওখানে যাওয়ার সাহস দেখাতে পারেন নি।

দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা তথৈবচ, বিশেষ করে নোটবন্দী ও অপরিকল্পিত জিএসটি চালু করার পর।আদানী অম্বানীর মত কিছু ব্যাবসায়ীরা ছাড়া কেউ স্বস্তিতে নেই। আদানী অম্বানীদের সুবিধার্থে কৃষকদের অভিশাপ তিন আইন এনেছিল মোদী সরকার তাদের ভয় দেখাতে। তাদের আতঙ্কবাদী হিসাবে দাগিয়ে দিয়েছিল এই সরকার।রাস্তায় পেরেক ফেলে অকথ্য অত্যাচার করা হয়েছিল।৭০০ জন কৃষক শহীদ হয়েছিলেন। ব্যবসায়ীদের ১৬ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ মাফ করে দিয়েছে এই সরকার। আর যারা আমাদের খাদ্য উৎপন্ন করে তাদের জন্য সরকার কিছু ভাবে না।তারা আইনিভাবে নূণ্যতম সহায়ক মূল্য বা এমএসপি চেয়েছিল।সরকার তা দেয় নি। শেষ পর্যন্ত সরকারকে পিছু হটতে হচ্ছে।

আজ যে শ্রম আইন সরকার এনেছে তাতে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ জলান্জলি দিয়ে মালিকপক্ষকে খুশী করার চিহ্ন । শিক্ষাক্ষেত্রে অরাজকতা স্পষ্ট, সাতবছরে সত্তরবার বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতির নামে গৈরিকীকরণ করা হচ্ছে শিক্ষাকে।বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে গোমুত্র গোবরের যুগে দেশকে নিয়ে চলেছে এই সরকার। মানুষেরা নিজেদের পছন্দ অপছন্দ প্রকাশ করতে পারছে না যা সংবিধানের মৌলিক অধিকারের বিরোধী। বিরোধীরা শত্রু নয়।সরকার যাতে মানুষের কল্যাণে কাজ করে তা সচেতন করে দেওয়া বিরোধী নেতা ও বিরোধী দলের প্রধান কর্তব্য। আমরা প্রধানমন্ত্রীকে ভয় পাই না,বরং সরকার আমাদের ভয় পায়।সেইকারণে আমি বা অন্য বিরোধীদলের সাংসদেরা বক্তব্য রাখতে উঠলেই বিজেপি সাংসদ মন্ত্রীরা রে রে করে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

তাই প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমার অনুরোধ দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বিরোধী দলের সঙ্গে একযোগে করার মনোভাব ও সাহস দেখান।এটাই ছিল রাহুল গান্ধীর বক্তব্যের নির্যাস।

রাহুল সংসদে প্রশ্ন তুললেন নির্বাচনী সংস্কার নিয়ে, কিভাবে ব্রাজিলের মডেলের ছবি হরিয়ানার ভোটার তালিকায় বাইশবার উঠল ? তিনি বললেন ভোট চুরি সবচেয়ে বড় রাষ্ট্রবিরোধী কাজ।এতে সাধারণ মানুষের ইচ্ছাকে গলা টিপে মেরে দেওয়া হয়।এরপর তিনি সরকারের কাছে কয়েকটি প্রশ্ন রাখেন। যেমন কেন সরকার নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ আইনে বাছাই কমিটিতে তিনজনের একজন দেশের প্রধান বিচারপতিকে সরিয়ে দিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে রেখেছেন ?

এর ফলে তিনজনের কমিটিতে দুজনই সরকারের প্রতিনিধি হওয়ায় বিরোধী নেতার মতামতের কোন মূল্য থাকছে না। সরকার যাকে তাকে এই পদে নিয়োগ করছে।

তার দ্বিতীয় প্রশ্ন কেন মোদী সরকার আইন সংশোধন করে নির্বাচন কমিশনারদের কোন কাজের জন্য শাস্তি থেকে রক্ষাকবচ দিয়েছেন ?

তৃতীয় প্রশ্ন,নির্বাচন কমিশন কেন নিয়ম বদল করে ভোটের ৪৫ দিন পরে সিসিটিভির ফুটেজ নষ্ট করে দেওয়ার নিয়ম চালু করেছে ?

এর ফলে নির্বাচন সংক্রান্ত মামলার তথ্য প্রমাণ নষ্ট হয়ে যায় ও কোন মামলা আদালতে দাঁড় করানো কঠিন হয়ে পড়বে।

তার চতুর্থ প্রশ্ন ছিল কেন কমিশন কম্পিউটার মেশিনে পড়া যায় (রিডেবেল) এমন ভোটার তালিকা দিচ্ছে না ?

এর ফলে একই নামের কজন দেশের বিভিন্ন জায়গায় নাম তুলে রেখেছে তা খুঁজে বার করা শক্ত।অথবা একই ব্যক্তির ছবি কতজন ব্যবহার করেছে তাও খালি চোখে বোঝা যায় না।

পঞ্চম প্রশ্ন,কেন ইভিএম নিয়ে বিরোধীদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হচ্ছে না? আসলে তিনি বলতে চাইছেন সরকার নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ আইনের বাছাই কমিটি পরিবর্তন করেছেন তার কারণ হচ্ছে কমিশন যাতে সরকারের জো হুজুরে পরিণত হয় ।অর্থাৎ মোদী শাহ যা বলবে সেভাবেই চলবে।

এরই মধ্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সংসদে বেশ কয়েকটি অপশব্দ ব্যবহার করেন নির্বাচনী সংস্কার নিয়ে আলোচনার সময়। রাহুল গান্ধীর চাপে অবশেষে শাহ নিজেই স্পীকারকে সেগুলিকে মুছে দিতে অনুরোধ করেন। যদিও রাহুলের সেই সংক্রান্ত প্রশ্নের কোন জবাব স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দিতে পারেন নি।

সত্যের জয় হয়েছে

শুভ মিত্র

মোদী সরকারের অসৎ উদ্দেশ্য এবং বেআইনি কার্যকলাপ সম্পূর্ণরূপে উন্মোচিত। ইয়ং ইন্ডিয়ান মামলায় কংগ্রেস নেতৃত্ব; শ্রীমতী সোনিয়া গান্ধী এবং শ্রী রাহুল গান্ধী জির বিরুদ্ধে ই.ডি.-র প্রক্রিয়াকে দিল্লির রাউস এভিনিউ কোর্টের বিশেষ আদালত সম্পূর্ণ বেআইনি এবং অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে রায় দিয়েছে।

আদালত রায় দিয়েছে যে ই.ডি.-র মামলাটি এখতিয়ারবিহীন; এতে কোনো এফআইআর নেই, যা ছাড়া কোনো মামলাই হতে পারে না।

প্রধান বিরোধী দলের বিরুদ্ধে গত এক দশকে মোদি সরকারের এই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আইনি প্রক্রিয়াটি আজ ভারতের জনগণের সামনে উন্মোচিত হলো।

কংগ্রেস দল আজ এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন ,

অর্থ পাচারের কোনো মামলা নেই, অপরাধলব্ধ সম্পত্তি বা সম্পত্তির হস্তান্তরেরও কোনো ঘটনা নেই; এই সব ভিত্তিহীন অভিযোগ রাজনৈতিক প্রতিহিংসামূলক শিকার, অপপ্রচার, মানহানি এবং প্রচারণার অংশ ছিল, যা আজ পরাজিত হলো।

কংগ্রেস দল এবং তাঁদের নেতৃত্ব সত্য এবং প্রত্যেক ভারতীয়ের অধিকারের জন্য লড়াই করতে বদ্ধপরিকর; তারা কখনও ভয় পাবেনা বলে জানিয়েছেন।র পর বহু কোম্পানির ওষুধের দাম লাগামছাড়া ভাবে বেড়ে যায়।

[redacted]বস্থার প্রেক্ষাপট ও সাম্প্রদায়িক দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার শক্তির অবস্থান

সুশান্ত দাসগুপ্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৮)

জনতা সরকারের অন্তর্দ্বন্দ্ব

১৯৭৭ সালের নির্বাচনে জয়যুক্ত হবার পর জনতা পার্টি ও সিএফডি মিলিতভাবে সরকার গঠন করে। সরকারে ডি.এম.কে ও অকালি দলও যোগ দেয়। সিপিআই (এম) ও এই বন্ধু সরকারকে সমর্থন করে। কিন্তু এই সরকার গঠন পর্বেই এদের মধ্যে তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়। জনতা পার্টি বৃহৎ শরিক ছিল এবং তারা মোরারজি দেশাইকে তাদের প্রধান নেতা বলে ঘোষণা করে নির্বাচনে লড়েছিল। স্বভাবতই এরা মোরারজি দেশাইকে প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য নির্বাচিত করে। অপরদিকে জগজীবন রাম প্রধানমন্ত্রী হবার ইচ্ছা পোষণ করতেন। তাঁর মত ছিল, তিনি সিএফডি (কংগ্রেস ফর ডেমোক্র্যাসি) গঠন না করলে ইন্দিরা গান্ধি ও তাঁর দলকে পরাস্ত করার সম্ভব হত না, অতএব তাঁকেই প্রধানমন্ত্রী করতে হবে। জগজীবন রাম গোঁসা করে বাড়িতে বসে থাকেন। শপথ গ্রহণের দিনও ঠিক করা যাচ্ছিল না। অবশেষে আর এস এস-এর বাহিনী গিয়ে জগজীবন রামের বাড়ি ঘেরাও করে প্রবল চাপ দিলে তিনি মন্ত্রিসভায় যোগ দিতে রাজি হন।

জনতা পার্টির সরকার ক্ষমতাসীন হয়ে অনেকগুলি কমিশন যথা শাহ কমিশন, রেড্ডি কমিশন প্রভৃতি গঠন করেন। এই কমিশনগুলির বিচার্য বিষয়গুলির মধ্যে ছিল জরুরি অবস্থায় অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থাসমূহ, পরিবার কল্যাণের নামে সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার, জবরদস্তিমূলক রাস্তার ধারের ঘরবাড়ি ভাঙা ইত্যাদি। কমিশনের কার্যধারা শুরু হওয়ার পর বিভিন্ন দিনে শুনানির সময় ইন্দিরা গান্ধি মন্ত্রিসভার একাধিক সদস্যকে কমিশনগুলির সামনে ডাকা হয়। ডাকা হয় সঞ্জয় গান্ধিকে এবং ইন্দিরা গান্ধিকে। কোনও একদিন শুনানির সময় ইন্দিরা গান্ধিকে জেল কাস্টডি দেওয়া হয়। তবে বলা হয় তিনি ইচ্ছা করলে জামিন নিতে পারেন। ইন্দিরা গান্ধি জামিন নিতে অস্বীকার করায় তাঁকে তিহার জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। এতে জনমানসে তীব্র বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়।

অপরদিকে মন্ত্রিসভার অভ্যন্তরে ও বাইরে, আর এস এস সরকার পরিচালনার বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয়ে প্রতিনিয়ত হস্তক্ষেপ করতে থাকে। তাই নিয়ে জনতা পার্টিতে তীর মতবিরোধ শুরু হয়। এই মতবিরোধের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই আর এস এস-এর পক্ষে দাঁড়ান। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চরণ সিংহ তাঁর শিবির সংগঠিত করতে থাকেন। এঁরা দাবি তোলেন জনতা পার্টির সদস্যদের দ্বৈত সদস্যপদ রাখা চলবে না। অর্থাৎ একজন ব্যক্তি যিনি জনতা পার্টির সদস্য, তিনি একই সঙ্গে আর এস এসের সদস্য থাকতে পারবেন না।

ইতিমধ্যে কর্নাটকের চিকমাগালুর সংসদীয় আসনটি শূন্য হলে ইন্দিরা গান্ধি ওই আসনের উপনির্বাচনে দাঁড়ান। তিনি বিপুল ভোটে জনতা পার্টির বীরেন্দ্র পাটিলকে পরাস্ত করেন।

ইন্দিরা গান্ধির এই জয়ে দিশেহারা হয়ে জনতা সরকার লোকসভায় একটি প্রস্তাব পাশ করে ইন্দিরা গান্ধির নির্বাচনী জয়কে বাতিল ঘোষণা করে। শুধু তাই নয়, তাঁরা এই মর্মেও প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে ইন্দিরা গান্ধি আর কখনও কোনও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না। এই ধরনের অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ফলে আবারও জনমানসে তীব্র বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়।

এই সময়ে জনতা সরকার বিদেশনীতিতেও পরিবর্তন হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্দেশে জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতিতে পরিবর্তন আসে। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মুক্তি সংগ্রামকে সমর্থন করা থেকে জনতা সরকার বিরত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নয়া দোস্ত চিনের সঙ্গে সখ্যতা হয় ও ওই দেশের ভিয়েতনাম আক্রমণের সময় পররাষ্ট্র মন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী চিন সফর করছিলেন। তাঁকে চিন সরকার চাপ সৃষ্টি করে তাদের সমর্থন করার জন্য। রাজ্যসভায় ভূপেশ গুপ্ত তীব্র আক্রমণাত্মক বক্তৃতা দিয়ে অবিলম্বে বাজপেয়ীকে দেশে ফিরিয়ে আনার দাবি করেন। বাজপেয়ী দেশে ফিরে আসেন। কিন্তু চিনের ভিয়েতনাম আক্রমণ প্রশ্নে জনতা সরকার নীরবতা অবলম্বন করে।

জনতা সরকারের শাসনে দেশজুড়ে সাম্প্রদায়িক গোলযোগ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিভিন্ন রাজ্যে হরিজনদের ওপর অত্যাচার শুরু হয়। এই পরিস্থিতিতে ইন্দিরা গান্ধি বিভিন্ন রাজ্যে সরাসরি চলে যান ও অত্যাচারিত মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ান। তাঁর প্রভাব আবারও বাড়তে থাকে। জনতা পার্টির সরকারও তীর অন্তর্দ্বন্দ্বে ভেঙে যায়।

চরণ সিংহের নেতৃত্বে শতাধিক সদস্য মোরারজি দেশাইয়ের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ করেন। ইন্দিরা গান্ধি তাঁকে সমর্থন জানান। সংসদে সংখ্যালঘু হয়ে পড়ায় মোরারজি দেশাই পদত্যাগ করেন। চরণ সিংহ শতাধিক সদস্য নিয়ে জনতা পার্টি থেকে বেরিয়ে এসে পুনরায় ভারতীয় লোকদল গঠন করেন। ইন্দিরা গান্ধি ও কংগ্রেসের সমর্থনে চরণ সিংহ প্রধানমন্ত্রীরূপে শপথ গ্রহণ করেন ও মন্ত্রিসভা গঠন করেন। কিন্তু আস্থা ভোটের আগে কংগ্রেস সমর্থন প্রত্যাহার করায় চরণ সিংহের মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। এর ফলে পুনরায় নির্বাচন অনিবার্য হয়ে পড়ে।

১৯৮০ সালের লোকসভা নির্বাচন, ইন্দিরা গান্ধির বিপুল জয় ও কমিউনিস্টরা

১৯৮০ সালের লোকসভা নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধি পুনরায় বিপুলভাবে জয়যুক্ত হয়ে ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর দল ৩৫৩টি আসনে জয় লাভ করে। কংগ্রেস প্রাপ্ত ভোটের ৪২.৬৯ শতাংশ ভোট লাভ করে। প্রাক্তন জনসংঘ জনতা পার্টি থেকে বেরিয়ে গিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি' নামগ্রহণ করে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ১৪টি মাত্র আসন লাভ করে। ইন্দিরা গান্ধির নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের এই বিপুল জয়ের পর সিপিআই(এম) দলের পক্ষ থেকে বিবৃতি দিয়ে বলা হয় যে ইন্দিরা গান্ধির এই জয় দেশে পুনরায় গণতন্ত্রের পক্ষে বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াল। আর এস এস পরিচালিত বিজেপির বিপর্যয়ে কি সিপিআই (এম) শঙ্কিত হয়েছিল ? এমনই ছিল তাদের ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি অনুধাবনের ব্যর্থতা। অথচ সিপিআই(এম)ও সিপিআইয়ের মিলিত আসন সংখ্যা এই নির্বাচনের পর পূর্ববর্তী ২৯ থেকে বেড়ে হয় ৪৭, ভোটের পরিমাণ পূর্ববর্তী ৭.১১ ভাগ থেকে বেড়ে হয় ৮.৭৩ ভাগ। সব বামপন্থীদের আসন হয় ৫৪। এর কারণ ইন্দিরা গান্ধি ও কংগ্রেস দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল, সাম্প্রদায়িক, দক্ষিণ ঘেঁষা মধ্যপন্থা ও খণ্ড আঞ্চলিকতাবাদের শক্তিগুলিকে পর্যুদস্ত করে দেয়। সেই সুযোগে আবারও , দক্ষিণ ঘেঁষা মধ্যপন্থা ও খণ্ড আঞ্চলিকতাবাদের শক্তিগুলিকে পর্যুদস্ত করে দেয়। সেই সুযোগে আবারও কমিউনিস্টদের ও বামপন্থীদের শক্তি বৃদ্ধি হয়। কংগ্রেসের শক্তি বাড়লে কমিউনিস্টদের শক্তি বাড়ে, এই তত্ত্ব আবারও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। (ক্রমশ)

বিশেষ নিবন্ধ

‘বন্দেমাতরম‘ দেশপ্রেমের অনুপ্রেরণা , নির্বাচনী কৌশল নয়

শান্তনু দত্ত চৌধুরী

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ‘ বন্দেমাতরম ‘ সঙ্গীতটি রচনা করেছিলেন ১৮৭৫ সালে । ১৮৮২ সালে এই সঙ্গীত রচনার সাত বছর পর তিনি ‘ আনন্দমঠ ‘ উপন্যাস রচনা করেন ও এই সঙ্গীতটির সঙ্গে পরবর্তী তিন স্তবক সংযুক্ত করে ওই উপন্যাসে অন্তর্ভুক্ত করেন। এই কালজয়ী উপন্যাসটির প্রেক্ষাপট ছিল নায়েব নাজিম রেজাখান ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির যৌথ শাসনে অভিশপ্ত ৭৬ এর মন্বন্তর ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহ। বন্দেমাতরম সঙ্গীত ও আনন্দমঠ উপন্যাস কালক্রমে জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম অনুপ্রেরণায় পরিণত হয়। ১৮৯৬ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ বন্দেমাতরম সংগীতটি সুরারোপ করে পরিবেশন করেছিলেন । তিনি তার আগে সংগীতটি বঙ্কিমচন্দ্রকে গেয়ে শুনিয়ে তাঁর অনুমোদন নিয়েছিলেন।পরবর্তী সময়ে সকল কংগ্রেস অধিবেশনে ‘বন্দেমাতরম ‘ গীত হত এবং এখনও হয় । ১৯০৫ সালে বঙ্গ ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় এই গানটি দেশপ্রেমমূলক সঙ্গীত রূপে সর্বত্র গীত হতে থাকে। ১৯০৬ সালে বরিশালে প্রাদেশিক কংগ্রেস অধিবেশনের সময় নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে প্রকাশ্য সমাবেশে ‘বন্দেমাতরম’ ধ্বনি দেওয়ার জন্য পুলিশ বেপরোয়া লাঠি চার্জ করে। ১০ হাজার মানুষ হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে বন্দেমাতরম ও আল্লা হো আকবর স্লোগান দিয়ে বরিশাল শহর পরিক্রমা করে। পুলিশের আক্রমণে মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা ও তাঁর পুত্র চিত্তরঞ্জন সহ অনেকে মারাত্মক ভাবে আহত হন। ওই কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন আব্দুর রাসুল।ওই সময় থেকে বাংলায় গড়ে ওঠে গুপ্ত বিপ্লববাদি সংগঠন অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর দল জ্জ অরবিন্দ ঘোষ সম্পাদিত পত্রিকার নাম ছিল ‘ বন্দেমাতরম।’ তিনি এই সংগীতটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। অহিংস অসহযোগ ও সশস্ত্র বিপ্লববাদী আন্দোলনের সকলেরই প্রাণের সঙ্গীত ও রণধ্বনি ছিল ‘বন্দেমাতরম।’

১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনের সঙ্গে মহাত্মা খিলাফত আন্দোলনকে যুক্ত করেন । জাতি ধর্ম নির্বিশেষে ভারতীয় জনসাধারণ এই আন্দোলনে যোগ দেন। মহাত্মা গান্ধি , আলি ভ্রাতাদের সঙ্গে আলোচনা করে আন্দোলনের স্লোগান ঠিক করেন বন্দেমাতরম , আল্লা হু আকবর , ভারত মাতা কি জয় ও হিন্দু – মুসলমানকি জয়। গন্ধিজি বন্দেমাতরম স্লোগানটি খুবই পছন্দ করতেন। তিনি মনে করতেন এই স্লোগান হচ্ছে “a graceful recognition of the intellectual and emotional superiority of Bengal” (Young India– September 8– 1920).

গত শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের মদতে দেশে আশ্চর্যজনক ভাবে একই সঙ্গে মুসলিম লিগ এবং হিন্দু মহাসভার কাজকর্ম বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। ‘ বন্দেমাতরম ‘ সঙ্গীতের শেষ তিন স্তবক নিয়ে আপত্তি ওঠে। ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষ যারা অপৌত্তলিক তাদের পক্ষে গানের এই অংশ নিয়ে অস্বস্তি প্রকাশ করা হয়। মুসলিম লীগ নেতা মহম্মদ আলি জিন্না এই গানে পৌত্তলিকতার প্রকাশ আছে বলে প্রচার করতে থাকেন। তিনি অনেকদিন কংগ্রেসে ছিলেন। কোনও দিন তিনি এই গানটি নিয়ে কোনও আপত্তি করেন নি। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে ৮ টি প্রদেশে কংগ্রেস জয়ী হয়। এর ভিতর উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ হওয়া সত্বেও সেখানে কংগ্রেস সীমান্ত গান্ধির প্রভাবে জয়ী হয়। বাকি ৩ টি প্রদেশে যথা পাঞ্জাব , বাংলা ও সিন্ধুতে মুসলিম রা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্বেও লীগ ক্ষমতায় আসার জন্য জিততে পারল না। ত্রিশঙ্কু বিধান সভা হল। লীগ বাংলায় ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টির সঙ্গে জোট মন্ত্রিসভা করে। হতাশ জিন্না কংগ্রেস সমর্থক মুসলমানদের মধ্যে প্রশ্ন তুলবার জন্য বন্দেমাতরম সঙ্গীতের বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করেন।

বন্দে মাতরম্
সুজলাং সুফলাং
মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং
মাতরম্।।

শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।।

সপ্তকোটিকণ্ঠকলকলনিনাদকরালে,
দ্বিসপ্তকোটীভুজৈর্ধৃতখর-করবালে,
অবলা কেন মা এত বলে।।
বহুবলধারিণীং

নমামি তারিণীং
রিপুদলবারিণীং
মাতরম্।।

তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম তুমি হৃদি তুমি মর্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে
বাহুতে তুমি মা শক্তি হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।। বনদে ।।
ত্বং হি দুর্গা দশ প্রহরণ ধারিণী
কমলা কমলদল বিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী
নমামি ত্বাং
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাং
সুজলাং সুফলাং মাতরম্ ।। বনদে ।।

শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাংঘ
ধরণীং ভরণীং মাতরং।।

উপরে বন্দেমাতরম সঙ্গীতের সম্পূর্ণ পাঠ রাখা হল। এর প্রথম তিন স্তবকই হওয়া হত। পরবর্তী তিন স্তবক উপন্যাসের প্রয়োজনে রচনা করে মূল সঙ্গীতের সঙ্গে যুক্ত করা হয়।

রাজ্যসভার কংগ্রেস দলের সাংসদ জয়রাম রমেশ গত ৯ ডিসেম্বর রাজ্যসভায় অসাধারণ তথ্যসমৃদ্ধ ভাষণ দেন। তিনি জানান সেপ্টেম্বর, ১৯৩৭ এর ২৮ সেপ্টেম্বর ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ বন্দেমাতরম সঙ্গীত নিয়ে লীগের প্রচার সম্পর্কে সর্দার প্যাটেল ও পন্ডিত নেহরু দুজনকেই জানান। ১৬ অক্টোবর নেতাজি কবিগুরু কে একটি চিঠি দিয়ে এই প্রসঙ্গে তাঁর মত জানতে চান।১৯ অক্টোবর কবিগুরু সুভাষকে চিঠি দেন। তিনি লেখেন— "we donót need endless rivalry because of one side obstinate refusal to yield." Once Bande Mataram was transformed into a national slogan– Tagore said in a press statement– many noble friends had made unforgettable and huge sacrifices for it. Tagore argued that the first part of the song stood on its own and had an inspirational quality– the part that he had sung in 1896.

১৭ অক্টোবর নেতাজি পন্ডিত নেহরুকে লেখেন ' প্রিয় জওহর তুমি যখন কলকাতায় আসবে তখন শান্তিনিকেতনে গিয়ে কবিগুরুর মত নিলে খুবই ভালো হবে।' ২০ অক্টোবর পন্ডিত নেহরু এই চিঠির উত্তরে লেখেন ' বন্দে মাতরম সংগীতটি নিয়ে সাম্প্রদায়িক শক্তি যে মিথ্যা প্রচার চালাচ্ছে সে বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। আমি কলকাতায় গিয়ে কবিগুরুর সঙ্গে দেখা করবো।' কবি ওই সময় কলকাতায় আসেন চিকিৎসার জন্য। গান্ধিজি ও পন্ডিত নেহরু ছিলেন শরৎ বসুর বাড়িতে। কবি সেখানে অসুস্থ গান্ধিজিকে দেখতে আসেন। কবির সঙ্গে নেহরু ও সুভাষ দেখা করেন।

২৬ অক্টোবর কবি কংগ্রেস সভাপতি জওহরলালকে চিঠি দিয়ে বন্দেমাতরম সঙ্গীত সম্পর্কে তাঁর মত জানান। চিঠিতে তিনি বলেন এই সঙ্গীতের প্রথম দুই স্তবক অপূর্ব ও সেখানে দেশভক্তির প্রেরণা আছে।তিনি মনে করিয়ে দেন তিনি এই অংশে সুরারোপ করে সাহিত্য সম্রাটকে শুনিয়েছিলেন ও তিনি তা অনুমোদন করেছিলেন।১৮৯৬ সালে কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি প্রথম তা গান। তিনি বলেন বঙ্গ ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে এই গান ছিল অনুপ্রেরনা।কবি মনে করিয়ে দেন এই গান গেয়ে দেশের বহু মানুষজীবন দান করেছেন। কাজেই গানের এই অংশ জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে থাকা উচিত। পরবর্তী স্তবক গুলিতে পৌত্তলিক দেবদেবীর আরাধনার বর্ণনা থাকায় তা যাঁরা অপৌত্তলিক ধর্ম পালন করেন যেমন মুসলিম ও অন্য কিছু ধর্ম তাঁদের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কবি বলেন তাঁর পিতাও অপৌত্তলিক ধর্মের উপাসক ছিলেন। তিনি বলেন জনসাধারণের সমস্ত অংশের অনুভূতিকে কংগ্রেসের জাতীয় ঐক্যের স্বার্থে বুঝতে হবে।

২৮ অক্টোবর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং এ পন্ডিত নেহরু কবির চিঠিটি পেশ করেন। ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন মহাত্মা গান্ধি, সর্দার প্যাটেল, চক্রবর্তী রাজাজি , ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ, নেতাজি সুভাষ, আচার্য নরেন্দ্র দেব, আচার্য কৃপালনী , শরৎ চন্দ্র বসু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। ওয়ার্কিং কমিটি সর্ব সম্মতি ক্রমে কবিগুরুর পরামর্শ গ্রহণ করেন। ৩০ অক্টোবর কবিগুরু একটি প্রেস বিবৃতির মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য জানিয়ে দেন।

১৯৫০ সালের ২৪ জানুয়ারি সংবিধান প্রণয়নকারী গণ পরিষদের সভায় পরিষদের সভাপতি ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ এই মর্মে প্রস্তাব পেশ করেন যে স্বাধীন ভারতের National Anthem হবে 'জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে' আর Natioal Song হবে 'বন্দেমাতরম।' সর্বসম্মতি ক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। ওই সভায় ড. আম্বেদকর ও শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা কেউ এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন নি। শ্রী রমেশ সভায় ঐতিহাসিক সব্যসাচী ভট্টাচার্যের ' হিস্টরি অফ বন্দেমাতরম ' বইটির কথা উল্লেখ করেন ও রাজ্যসভার সকল সদস্যকে ১ টি করে উপহার দেন।

গত ৭ নভেম্বর দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 'বন্দেমাতরম'

সঙ্গীত রচনার সার্ধশতবর্ষ উদযাপনের জন্য আহুত এক সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে কংগ্রেসকে আক্রমণ করেন। তিনি বলেন এর ফলে দেশভাগের বীজ বপন করা হয় জ্জ মোদীজি কি জানেন না, ১৯৩৭ সালে হিন্দু মহাসভার অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে সাভারকর বলেছিলেন – 'India cannot be assumed today to be a Unitarian and homogeneous nation– but on the contrary–there are two nations in the main– the Hindus and the Muslims.These are two nations which are living side by side in India.' এই বক্তব্যের সঙ্গে জিন্না ও মুসলিম লীগের বক্তব্যের কোনও পার্থক্য ছিল না। নরেন্দ্র মোদির কী এই বক্তৃতা কথা জানা ছিল না ? সাভারকর ১৯২৩ সালে 'হিন্দুত্ব' নামক পুস্তক লিখে প্রথম দ্বিজাতিতত্ব প্রচার করেন। আর আর এস এস এর দ্বিতীয় সর সঙ্ঘ চালক মাধব সদাশিবরাও গোলওয়ালকর ১৯৩৮ সালে তাঁর We and our Nation defined গ্রন্থে লেখেন ' মুসলমান ও খ্রিস্টান– এদের এই দেশে থাকতে গেলে তাদের হিন্দুদের সংস্কৃতি মেনে চলতে হবে, হিন্দুদের ভাষায় কথা বলতে হবে, হিন্দুদের মেনে চলতে হবে। নইলে তাদের এদেশে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হয়ে থাকতে হবে। এমনকি তাদের ভোটাধিকার পর্যন্ত থাকবে না।' এই সব কথাবার্তা বলে তাঁরা কি দুই ধর্মের মানুষের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করেননি ? কী বলবেন মোদিজি ?

লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী বলেন কংগ্রেস সভাপতি নেহরু সুভাষচন্দ্র বসুকে চিঠি লিখে বলেন বন্দেমাতরম সঙ্গীতটি নিয়ে আলোচনা হওয়া উচিৎ। এদিন ভাষণের সময় মোদীজি বেশ কয়েকবার সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কে বঙ্কিমদা বলে উল্লেখ করেন। অবশেষে তৃণমূল থেকে সৌগত রায় বলেন ' বঙ্কিমদা কী ! তাঁকে বঙ্কিম বাবু বলুন ।' তখন প্রধানমন্ত্রী বঙ্কিম বাবু বলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৩৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন।এই বছর তাঁর ১৮৭তম জন্ম বর্ষ। তাঁকে বঙ্কিম বাবু বলা যায় কি ? বাংলার মানুষ তাঁকে সাহিত্য সম্রাট বা ঋষি বলে উল্লেখ করেন ।ওই দিন প্রধানমন্ত্রী মাষ্টার দা সূর্য সেনকে, মাষ্টার সূর্য সেন ও অনুশীলন সমিতির নেতা পুলিন দাসকে, পুলিনবিকাশ দাস বলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত বলেন বঙ্কিমদাস চট্টোপাধ্যায়। বিজেপির অনুরাগ ঠাকুর অবলীলাক্রমে বন্দেমাতরম সঙ্গীতকে কয়েকবার ''বন্দে ভারত'' বলে উল্লেখ করেন। বাংলার সমাজ ,সংস্কৃতি , সাহিত্য সম্পর্কে দেশের প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর দলের অন্যান্য নেতারা কতটা অবহিত তা ভালো ভাবেই বোঝা গেলো।

প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বলেন , প্রধানমন্ত্রী যেটা বলছেন না যে তার তিনদিন আগে নেতাজি ১৭ অক্টোবর নেতাজি পন্ডিত নেহরুকে চিঠি দিয়ে বলেছিলেন তিনি যেনো গুরুদেবের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করেন। পন্ডিতজি তাই করেছিলেন। প্রিয়াঙ্কা বলেন বন্দেমাতরম সঙ্গীত নিয়ে কংগ্রেস গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের মত গ্রহণ করে। কেনোনা এই বিষয়ে তিনিই ছিলেন প্রধান ভূমিকায়। প্রধানমন্ত্রী গত ৭ তারিখে বিজ্ঞান ভবনের সভায় বলেছেন ১৮৯৬ সালে গুরুদেব একটি অধিবেশনে প্রথম বন্দেমাতরম গেয়েছিলেন। প্রিয়াঙ্কা বলেন, তবে তিনি বলেন নি ওটা কোন অধিবেশন ছিল ।ওটা কি আর.এস.এস - এর অধিবেশন ছিল ? নাকি হিন্দু মহাসভার ? আসলে ওটি ছিল কংগ্রেসের। প্রিয়াঙ্কা বলেন প্রধানমন্ত্রী ভালো বক্তৃতা করেন , কিন্তু ভুল তথ্য দেন ।তাঁর আত্মবিশ্বাস কমেছে। বার বার পন্ডিত নেহরুকে আক্রমণ করা নিয়ে প্রিয়াঙ্কা কটাক্ষ করে বলেন মোদিজি ১২ বছর প্রধানমন্ত্রী আছেন, নেহরুজি অতদিন দেশের জন্য জেলে ছিলেন। পন্ডিত নেহরুকে নিয়ে বিজেপির যত নালিশ তাই নিয়ে ২৪ ঘণ্টা আলোচনা করে তাতে ইতি টানা হোক। তারপর বেকারী ,মূল্যবৃদ্ধি , অগ্নিবীর, পিএমও তে কি হচ্ছে সেসব নিয়ে আলোচনা হোক। লোকসভায় গৌরব গগৈ , মহুয়া মৈত্র , ইকরা হাসান, অখিলেশ যাদব, কাকলি ঘোষ দস্তিদার তথ্যসহ আলোচনা করেন। রাজ্য সভায় সঞ্জয় সিং বন্দেমাতরম সঙ্গীতের সঙ্গে বিজেপির কী সম্পর্ক তাই নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন এদের পূর্বজরা কোনও দিন স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেন নি। তিনি বলেন চার জন ট্র ((এর নেতার নাম বলুন যিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়ে জেল খেটেছেন।এর কোনও উত্তর বিজেপি বেঞ্চ থেকে দেওয়া হয়নি।

মোদীর ওই বক্তৃতার পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খারগে বলেন ব্রিটিশদের ভয়ে আর.এস.এস ও হিন্দু মহাসভার নেতা ও কর্মীরা কোনও দিন 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত গাইতো না । তারা আজ দেশ প্রেমিক সাজছে। তারা অর্থাৎ আর.এস.এস বরাবরই তাদের শাখায় গায় তাদের গান ' নমস্তে সদা বৎসলে মাক্রভূমি। ' যা গাইলে কখনও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণের মুখে পড়তে হত না। বন্দেমাতরম গীত গেয়ে হাজার কংগ্রেস কর্মী শহিদ হয়েছেন।কংগ্রেসের ব্লক স্তরের সভাতেও ' বন্দেমাতরম ' গাওয়া হয় জ্জ

সামনে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনজ্জ তাই এখন নরেন্দ্র মোদীকে পশ্চিমবঙ্গ প্রেমী সাজতে হবে। কেনো তিনি বা তাঁর দল 'বন্দেমাতরম ' সঙ্গীত রচনার শত বর্ষ বা ১২৫ তম বর্ষ পালন করেন নি ?